উনিশ বছর শরণার্থী শিবিরে পৃষ্ঠা ২
দাঙ্গা–বিধ্বস্ত বড়োভূমি থেকে ফিরে পৃষ্ঠা ৩
বড়োভূমিতে দাঙ্গার দিনলিপি পৃষ্ঠা ৬
বড়োভূমি ও বড়ো জনজাতির ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১
বড়ো মুসলমান সংঘর্ষের প্রেক্ষিত পৃষ্ঠা ১৩
১৯৯৬ সালের বড়ো আদিবাসী সংঘর্ষের বৃত্তান্ত পৃষ্ঠা ১৬
বড়ো মুসলমান সংঘর্ষের অবসান কোন পথে পৃষ্ঠা ১৭
আত্মঘাতী সংঘর্ষ : সমাধান কোন পথে পৃষ্ঠা ১৯
কোকরাঝাড়ের ডায়েরি পৃষ্ঠা ২২
বড়ো নেত্রীর চোখে বড়ো মুসলমান সংঘর্ষ পৃষ্ঠা ২৪
শরণার্থী শিবির থেকে বলছি পৃষ্ঠা ২৬

জুলাই–আগস্ট ২০১২ ☐ত্রয়োদশ বর্ষ ☐চতুর্থ সংখ্যা ☐১০ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

দাঙ্গার নেপথ্যে

বড়ো জাতির নিজ ভূমে পরবাসী হওয়ার ইতিহাস অনেক পুরোনো। ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী আদিম অধিবাসী বড়োরা ভারতবর্ষের চাষিসমাজ গড়ে ওঠার আগেই সেখানে বসবাস করত। বর্ণ বা জাত ব্যবস্থা ভিত্তিক গ্রামসমাজে হাল–লাঙল দিয়ে চাষ এল ব্রহ্মপুত্রের উর্বর নদী উপত্যকায়। ক্রমশ বড়োরা গভীর অরণ্যে সরে যেতে থাকে। চাষের কাজে তারা সেচ ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চালিয়ে যেতে থাকে ঝুম চাষ আর শিকার।

আমরা সম্প্রতি আসামে গিয়েও শুনেছি, বড়োদের শিকারের দক্ষতার কথা। তীর দিয়ে ময়াল সাপকে গাছের গায়ে গেঁথে ফেলার গল্প শুনেছি গুয়াহাটির প্রবীণদের কাছে। দুঃখের কথা, আজ সেই তীর–ধনুক আর বাঁটুল (গুলতি) ব্যবহার হল প্রতিবেশি আর এক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষি এসেছে অনেক পরে। তারপর এসেছে চা বাগিচার শ্রমিক। তাদের মধ্যেও এসেছিল অন্য প্রদেশের বহু আদিবাসী। প্রায় এক শতাব্দী বড়ো জাতি এ নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন হয়নি। আমরা এমন গল্পও শুনেছি, বড়ো গাঁওবুড়া উদারভাবে আগত অন্য জাতির মানুষকে তাদের পাশে ঠাঁই দিয়েছে।

সমতলের বড়োরা যখন ঝুম চাষ থেকে হাল–লাঙল দিয়ে ধান চাষে এল, সময়টা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের হাত ধরে আমাদের আধুনিক রাজনীতির হাতেখড়ি হয়ে গেছে। আমরা শিখে গেছি রাষ্ট্রের কাছে দাবি করতে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট তো এসেছেই। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেই 'অল আসাম প্লেন্‌স ট্রাইবাল লিগ' এসে গেছে। সকলেই রাষ্ট্রের প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। যে আদিবাসী, অরণ্যবাসী, পাহাড়িরা আলাদা স্বশাসিত সমাজ হিসেবে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর জীবনযাপন করত, তারাও শিখল রাষ্ট্রের কাছে স্বশাসন প্রার্থনা করতে।

নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের কাছে এক চায়ের দোকানে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে। এরা বাঙালি মুসলমান। এখানকার গ্রামের খেতে শালিধান (আমন) লাগানো হয়েছে। একজন বলছিলেন, চায়না ধান নামে একটা বিদেশি বীজের কথা। দেশি স্থানীয় বীজে ফলন যেখানে বিঘা প্রতি দশ মণের নিচে, চায়না বীজে ফলন বিশ মণ। উপযুক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও জল ব্যবহার করলে নাকি হাতেনাতে ফল পাওয়া যায়। এই হল আধুনিক চাষ।

এর সঙ্গেই রয়েছে আধুনিক জীবনযাপন এবং আধুনিক শিক্ষা। তার ডালি উজার করে বসে রয়েছে আধুনিক বাজার। ফলে নানান দিক থেকে জমির চাহিদা এবং কেনাবেচা বেড়েছে। তথাকথিত স্বশাসিত বড়োভূমি এবং তার দস্তুর দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না জমির টানাপোড়েন।

বড়ো যুবক এমনও বলে ফেলছেন, 'অবৈধ বাংলাদেশি' তাড়াতে পারলে নাকি বড়োভূমির আধা জমি ফাঁকা হয়ে যাবে! কী নিশ্চিন্তি!

যে ভূমির অধিকারের জন্য সারা দেশ জুড়ে আদিবাসীরা লড়াই করছে, প্রাণ দিচ্ছে, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ে কোথাও কোথাও ফিরিয়ে দিচ্ছে কর্পোরেট লুঠেরাদের। একই সময়ে সেই ভূমির অধিকারের জন্য দাঙ্গায় শামিল হয়েছে বড়ো–সমাজ। রক্তাক্ত আসামের বড়োভূমি;

ভূমি থেকে উৎখাত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বাঙালি মুসলমান।

উনিশ বছর শরণার্থী শিবিরে

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বড়োভূমিতে বহু জাতি বা গোষ্ঠীগত দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৯৩-এর অক্টোবর মাসে বঙ্গাইগাঁও জেলার বড়ো-মুসলমান দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশজন নিহত হয়। সেইসময় উৎখাত হওয়া প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালি মুসলমান মানুষ কোকরাঝাড় এবং বঙ্গাইগাঁও জেলার বেশ কিছু শরণার্থী শিবিরে আজও চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এরকমই একটি শিবিরে আমরা হঠাৎই গিয়ে পৌঁছাই। বঙ্গাইগাঁওয়ের হাপাসরা গ্রামে সেই শিবির কমিটির সম্পাদক হাবিলউদ্দিন আহমেদের নিজস্ব প্রতিবেদন এখানে প্রকাশ করা হল। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে বরপেটা জেলাতেও বড়ো-মুসলমান দাঙ্গায় প্রায় একশোজন নিহত হয়। তাদের অনেকে আজও বাঁশবাড়ি শরণার্থী শিবিরে রয়েছে। ১৯৯৬ সালের মে মাসে কোকরাঝাড় ও বঙ্গাইগাঁও জেলায় বড়ো-সাঁওতাল দাঙ্গায় প্রাণ হারায় দুই শতাধিক মানুষ এবং গৃহহীন হয় দুই লক্ষের বেশি মানুষ। ১৯৯৮ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ফের বড়ো-সাঁওতাল সংঘর্ষে পঞ্চাশের বেশি মানুষ মারা যায়। মাঝে সাময়িক বিরতির পর ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসে উদালগুড়ি ও দরং জেলায় মুসলমান-বড়ো সংঘর্ষে প্রায় সত্তরজন মারা যায়, দুই গোষ্ঠীর এক লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন হয়। পরিসংখ্যানগুলি পাওয়া গেছে 'রিফিউজি ওয়াচ', ৩৭, জুন ২০১১, সাংবাদিক নির্মাল্য ব্যানার্জির প্রতিবেদন থেকে। অনুলিখন জিতেন নন্দী।

আমরা ১৯৯৩ সালের ৭ অক্টোবর উত্তরাঞ্চলের আমডাঙা, মিলনবাজার, আনন্দবাজার, ভওরাগুড়ি, পাটাবাড়ি, মালিভিটা ইত্যাদি গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে এসেছি। সেদিন ভোররাতে চারটার সময় বড়ো উগ্রপন্থীরা আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তখন ওই অঞ্চলটা ছিল পুরোনো কোকরাঝাড় জেলায়, এখন বিটিএডি এলাকার মধ্যে চিরাং জেলায়। ওখানে ৫৪টা গ্রামে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি ছিল। এলএমজি নিয়ে ওরা আক্রমণ করে। ভয়ে ঘরদোর ছেড়ে লোকে ভুটানের দিকে রওনা দেয়। তারা পায়ে হেঁটে ভুটানের গেলামপুর হয়ে বঙ্গাইগাঁওয়ে আসে। পরবর্তীতে কোকরাঝাড়ের ডিসি-কে জানানোর পর আমাদের গাড়ি দেওয়া হল। আমাদের নিয়ে এসে কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, বাসুগাঁওয়ের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে রাখা হয়। পনেরো দিন আমরা ওখানে ছিলাম। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এসে আমাদের উত্তরাঞ্চলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সেখানে তিনভাগে আমরা পাঁচ বছর ছিলাম। একদিন হঠাৎ রাতের অন্ধকারে সিআরপি বাহিনী আমাদের ছেড়ে চলে এল। আমাদের লোকেরা সকালে উঠে দেখল, সিআরপি নেই। কী হল? ভয়ের তাড়নায় একসময় আমরা নিজেরাই গাড়ি ভাড়া করে এখানে এলাম। এই জায়গাটা আমরা ভাড়া করে ঠিক করেছিলাম। ২০০০ সালে ১১২২টা পরিবার এখানে এসেছিলাম। লোকে কী খাবে? ইটভাটায় পরিবার নিয়ে গিয়ে, বিভিন্ন শহরে রিকশা টেনে, দৈনিক মজুরি করে লোকে পয়সা রোজগার করেছে। ২০০৪ সালে সরকার আমাদের ভেরিফাই করল। মণ্ডল এসে সার্ভে করল। ৫৫৮ পরিবার তাতে সন্নিবিষ্ট হল। যারা বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল, তারা ভেরিফাই থেকে বাদ পড়ল। এরকম ৫৮৮টা পরিবার বাদ পড়ল। যাদের ভেরিফাই হল, তাদের সরকার পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দিল। তারা এক পোয়া, আধা পোয়া মাটি নিয়ে একটা-দুটো ঘর করে চলে গেছে। বাকি ৫৮৮টা পরিবার আমরা উনিশ বছর এই ক্যাম্পে আছি।

বর্তমানে ১৯ জুলাই থেকে বড়োল্যান্ডে আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেল। তার আগে আমরা বঙ্গাইগাঁও শহরে যেতাম কাজ করতে। এই গণ্ডগোলের পর থেকে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। কামলা খাটতে গেলে ওরা হাজিরা নেয় না। বিটিএডি থেকে ঘোষণা করেছে, যারা কামলা করার জন্য আসবে, তাদের কাজ-কামে নেওয়া হবে না। যে নেবে, তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। আমাদের বলে বাংলাদেশি। এই অবস্থায় কোনো কোনোদিন আমাদের পরিবার নিয়ে না খেয়েও থাকতে হয়।

এখানে আধি করালি করে (ভাগে) মাটি নেওয়া যায়, যার সুবিধা আছে নিতে পারে। আমাদের টাকাপয়সা নাই, গরুবাছুর নাই, কী করে পারব?

কারও ১৯৫১ সাল থেকে, কারও ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে কমপ্লিট কাগজপত্র আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা আগের থেকে আসামে আছে। উনিশ বছরে আজ পর্যন্ত উনত্রিশবার গুয়াহাটির দিসপুরে ধরনা দিয়েছি, তেরোবার আমরণ অনশন করেছি। এবছরের ১৫ মার্চ আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর বাসভবনে আমাদের ডাকা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বদরুদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ এবং শরণার্থীদের প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। সেখানে আমরা দাবি দিয়েছিলাম, আমাদের শরণার্থীদের দুই লাখ করে টাকা দিতে হবে; একটা করে ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর দিতে হবে; আধা বিঘা করে মাটি দিতে হবে আর একটা করে বিপিএল কার্ড দিতে হবে। উনি বলেছেন, আমি মাটি দিতে পারব না। তবে পঞ্চাশ হাজার করে টাকা, একটা করে ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর আর বিপিএল কার্ড, এই তিনটা বস্তু দিয়ে আমি আপনাদের সমস্যার সমাধান করব। উনি তিনমাস সময় নিয়েছিলেন। আজ সাতমাস চলছে, কোনো কাজই আমরা আসাম সরকারের কাছ থেকে পাইনি।

আমরা যে ৫৮৮ পরিবার আছি, চাঁদা উঠিয়ে আমরা এই এগারো বিঘা মাটিটার জন্য বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া দিই। প্রথমে ছিল সতেরো হাজার। তারপর বেড়ে বেড়ে এই জায়গায় এসেছে। উনিশ বছর এইভাবে আছি।

দাঙ্গা–বিধ্বস্ত বড়োভূমি থেকে ফিরে

জিতেন নন্দী

গুয়াহাটি থেকে আমাদের সফর শুরু হয়েছিল ৮ আগস্ট। কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম আমি, মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন, আর কামরুজ্জামান খান। নারায়ণ নন্দী চলে এলেন ডিমাপুর থেকে। কোচবিহার থেকে পরদিন সকালে এলেন রামজীবন ভৌমিক। এই নিয়ে তৈরি হল আসামের হালফিল জাতিদাঙ্গার স্বরূপ অনুসন্ধানকারী আমাদের দল। সরাসরি দাঙ্গা বা সংঘর্ষ অনেকটা প্রশমিত হলেও তার জের ভালোমাত্রায় রয়ে গেছে আসাম জুড়ে। আমরা তা টের পেলাম সরাইঘাট এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে যাওয়ার পথেই।

আপনি কি বাংলাদেশি?

ট্রেনের কামরায় আমাদের বসার জায়গায় সামনাসামনি দুটো আসনে জানলার ধারে ছিলেন দুজন মাঝ বয়সের মহিলা। একজন ওড়িয়া, তিনি আসছিলেন উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে, যাবেন গুয়াহাটি ছাড়িয়ে তেজপুর। ওখানে ওঁর স্বামী এয়ারফোর্সে কাজ করেন। আর একজন অসমিয়া, পেশায় উকিল। তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন তাঁর মক্কেলের কাজে। চলার পথে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। নিজেদের মধ্যে গল্পের ফাঁকে ঝালমুড়ি, ডালমুট দেওয়া–নেওয়াও চলল। বালেশ্বরের মহিলা যখন হেলালউদ্দিনের নাম জানলেন, তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি বাংলাদেশি?' হেলালউদ্দিন বললেন, 'আমি আজন্ম মুর্শিদাবাদের মানুষ, কোনোদিন বাংলাদেশে যাওয়াও হয়নি।' কথায় কথায় মহিলা বললেন, 'দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে বাংলাদেশি আছে।' হেলালউদ্দিন উত্তর দিলেন, 'না, একজনও নেই।' মুহূর্তে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপের সুরটা যেন কেমন একটু কেটে গেল। তখন ট্রেন কামাখ্যা ছেড়ে গুয়াহাটি স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে। রেললাইনের দুপাশে টানা ঝুপড়ি–বস্তি। সেইদিকে তাকিয়ে আগের কথার জের ধরেই অসমিয়া মহিলা বললেন, গুয়াহাটিতে লেবার বা রিকশা টানার কাজে আগে বিহারিরা আসত। ইদানীং তাদের তেমন আসতে দেখা যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে গরিব বাঙালি মুসলমানরা এসে সেইসব কাজ করছে। অসমিয়াদের মধ্যেও গরিব নেই তা নয়, তবে তাদের এইসব কাজে তেমন পাওয়া যায় না। আমি বুঝতে পারলাম, ইঙ্গিতটা বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের দিকেই।

শুরুতেই গুয়াহাটির বিস্ফোরণ

গুয়াহাটিতে আমাদের প্রথম সন্ধ্যায় পল্টনবাজারে ঘটল গ্রেনেড বিস্ফোরণ। বিকেলে আমরা গিয়েছিলাম 'সংগ্রামী শ্রমিক কেন্দ্র'র নেতা তাপস দাসের বাড়িতে। সেখানে কথাবার্তা সেরে গেস্ট হাউসে ফেরার পরই তিনি ফোন করলেন। জানতে পারলাম বিস্ফোরণের সংবাদ। গুয়াহাটি স্টেশনের লাগোয়া পল্টনবাজার এলাকা। সকালেই ট্রেন থেকে নেমে আমরা ওখান দিয়ে এসেছি। সুরক্ষা বাহিনীর একজন জওয়ান প্রাণ হারালেন, আহত হলেন অনেকে। সেদিন ছিল প্রয়াত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন। পরদিন সংবাদপত্রে শিরোনাম হল, 'সুধাকণ্ঠের জন্মদিনে রক্তস্নাত গুয়াহাটি'। পরে এটাও জানা গেল, বিস্ফোরণ ঘটানোর দায় স্বীকার করে নিয়েছে আলফা।

এই হল আসামের প্রাত্যহিক জীবনের ছবি। শুধু আসাম নয়, উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের প্রাত্যহিকতা কমবেশি এরকমই। এর মধ্যেই শুরু হল আমাদের বড়ো স্বশাসিত অঞ্চলের সফর।

একই সময়ে গুয়াহাটিতে বশিষ্ঠ মন্দিরের কাছে 'শান্তি সাধনা আশ্রম'–এ 'সর্ব সেবা সংঘ'–এর উদ্যোগে শান্তিযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, গুজরাত, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও আসাম থেকে আসা প্রায় চল্লিশ জন কর্মী। প্রথমে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ওঁদের সঙ্গে কোকরাঝাড়ে যাব। সেই মতো আমরা ১০ তারিখ ওই আশ্রমে গেলাম। ১০–১১ দু–দিন ওখানে আসামের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক ও সমাজকর্মীরা এসে সাম্প্রতিক দাঙ্গা প্রসঙ্গে আগত কর্মীদের ওয়াকিবহাল করছিলেন। আমরা সেই আলোচনায় কিছুটা অংশ নিই। পুরোটা থাকতে পারিনি, কারণ আমরাও নিজেদের উদ্যোগে কিছু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করি।

এদিন কে বি রোডে বই কিনতে গিয়ে দোকানদার এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি কথায় কথায় আমাদের আসামের 'কল্যাণ আশ্রম' সম্বন্ধে অবহিত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, কীভাবে জঙ্গল ও ট্রাইবাল বেল্টে তারা আদিবাসী ও জনজাতির মধ্যে সমাজসেবার কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর দেওয়া পুস্তিকা থেকে আমরা জানতে পারি, 'অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম'–এর সঙ্গে এরা যুক্ত। অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' এখানে সক্রিয়।

১১ তারিখ রাতে 'সর্ব সেবা সংঘ'–এর চন্দন পাল জানালেন, ওঁদের কোকরাঝাড় যাত্রা শুরু হবে ১৩ তারিখ। ওঁরা ২০ তারিখ পর্যন্ত বড়োভূমিতে থাকবেন। আমাদের মেয়াদ ১৬ তারিখ পর্যন্ত। তাই আমরা আর অপেক্ষা না করে পরদিন সকালেই কোকরাঝাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

কোকরাঝাড়ে প্রথমদিন

কোকরাঝাড় স্টেশনে নামলাম আমরা চারজন। গতকাল নারায়ণ নন্দী ডিমাপুরে কাজে ফিরে গেছেন। প্ল্যাটফর্মে নেমেই চোখে পড়ল একটা পোস্টার। ওতে ইংরেজি, হিন্দি আর অসমিয়তে যা লেখা আছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কোনো জিনিস কিনবেন না। বাংলাদেশিদের কোনো ধরনের কাজ দেবেন না। নাহলে ১০,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে।' কোনো প্রেসলাইন নেই, শুধু লেখা আছে 'বি ট্রু ইন্ডিয়ান' এবং 'জয় হিন্দ'। 'বেআইনি' বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে 'বেআইনি' ছাপা পোস্টারে হুমকি! কারণ ট্রু ইন্ডিয়ানদের ওসব আইন–টাইনের দরকার হয় না। প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে এসেও দেখলাম ওই একই পোস্টার সর্বত্র। বুঝলাম, এখানে আমাদেরও প্রকৃত ভারতীয়ত্বের পরীক্ষা (নাকি অগ্নিপরীক্ষা!) দিতে হতে পারে।

আমার এবং হেলালউদ্দিনের মুখে দাড়ি রয়েছে। চারপাশে একজনও দাড়িওয়ালা লোক চোখে পড়ল না। কোকরাঝাড় শহর হল বড়োভূমির সদর। কোথায় থাকব? হেলালউদ্দিনের মোবাইলে এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, তোমরা সার্কিট হাউসে চলে যাও। আমরা একটা ছোটো গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে গেলাম সার্কিট হাউসে। সেখানে প্রচুর জায়গা। কিন্তু ডিসি অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে।

আমরা গেলাম ডিসি অফিসে। সেখানে এডিসি–র কাছে দরখাস্ত করতে বলা হল। আমি একটা দরখাস্ত লিখে তাঁকে দিলাম। তিনি বললেন, আপনারা থাকতে পারতেন, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি যে কোনো সময় মন্ত্রীরা এসে পড়তে পারে। তখন খালি করে দিতে হবে।' আমি নাছোড়বান্দা। ওঁকে বললাম, 'যাই হোক, আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' তিনি ওঁর একজন অফিসার ত্রিদিব চক্রবর্তীকে ডেকে বললেন, 'আপনার বাংলার লোক এসেছেন। এঁদের একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিন।' ত্রিদিববাবু আমাদের তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। সামান্য আলাপ–পরিচয় হল। ফোন করে বাবুলাল দাস নামে একজনের ওপর দায়িত্ব দিলেন হোটেল বুক করার। বাবুলাল দাস শরণার্থী শিবিরের রিলিফ মেটিরিয়াল সাপ্লায়ারের কাজ করছেন। তবে আমাদের দুজনের দাড়ি দেখে ত্রিদিববাবু একটু শংকিত হলেন। বললেন, 'আমারও দাড়ি ছিল। গণ্ডগোলের পর রোজ শেভ করছি। যাই হোক, বাবুলাল রুইসুমোই হোটেলে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারা চলে যান।'

আমরা হোটেলে গেলাম বটে। কিন্তু ইতিমধ্যেই চারদিকের থমথমে পরিস্থিতি দেখে সকলেই — বিশেষত আমাদের দুই মুসলমান সফরসঙ্গী — একটু ঘাবড়ে গেলেন। আমাদের চিন্তা হল, কীভাবে আমরা বড়োভূমিতে কাজ শুরু করব?

দুপুরে আমি এবং রামজীবন ভৌমিক গেলাম বড়'সা সংবাদপত্রের দপ্তরে। এই কাগজের সম্পাদক চিনো বসুমাতারির একটা যোগাযোগ গুয়াহাটি থেকে পেয়েছিলাম। প্রসঙ্গত, আমরা বাংলায় লিখছি 'বড়ো', 'বড়োভূমি' ইত্যাদি। বড়োভূমিতে দেবনাগরি অক্ষরে লেখা হয় 'বড়'ল্যান্ড', ইংরেজিতে Bodoland।

ছোট্ট বড়'সা প্রেস। চিনো বসুমাতারি তখন পরদিনের কাগজ ছাপার কাজে খুব ব্যস্ত। ব্যস্ততার মাঝেই আমরা আলাদা করে ওঁর সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বললাম। দুটো কথা বুঝলাম। প্রথম কথা, প্রত্যেক বাঙালি মুসলমানকেই এখন বড়োভূমিতে প্রমাণ দিতে হবে যে সে বাংলাদেশি নয়। দ্বিতীয়, বড়োভূমি মূলত ট্রাইবাল বেল্ট অ্যান্ড ব্লকের অন্তর্গত। ট্রাইবাল বেল্ট্স অ্যান্ড ব্লক্স–এ নন–ট্রাইবালের জমিজায়গার অধিকার নেই। সাম্প্রতিক দাঙ্গার পর এই কথাগুলো সমস্ত বড়ো মানুষের মুখে খইয়ের মতো ফুটছে![১]

চিনো বসুমাতারির কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে আমরা দুজন গেলাম তিতাগুড়িতে। শুনলাম, ওখানে বড়ো শরণার্থীদের শিবির রয়েছে। অটোরিকশা থেকে তিতাগুড়িতে নেমে দেখি দুদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। কিন্তু শিবির নেই। কয়েকদিন আগে নাকি শিবির উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোরাং নদীর কাছে অন্য কোথাও। বাইকে চেপে আসছিলেন একজন। ওঁকে আমরা দাঁড় করালাম। পরিচয় হল। বিজয় কুমার ব্রহ্ম, কোকরাঝাড়ে বড়ো পিপ্‌লস ফ্রন্টের ইউথ উইংসের চেয়ারম্যান। আমাদের তিনি ওই গ্রামের ভিসিডিসি–র (ভিলেজ কাউন্সিল ডেভলপমেন্ট কমিটি) পাকা দালানে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। রাস্তার ধারেই রয়েছে বড়োদের ধর্মস্থান 'বাথৌ' এবং আবসু–র (অল বড়ো স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন) দপ্তর।

পরে জানতে পেরেছি, বড়োভূমির সমস্ত গ্রামেই ভিসিডিসি রয়েছে। এখানে পঞ্চায়েত নেই। ভিসিডিসি–র প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান। এছাড়া রয়েছে গ্রামের 'গাঁওবুড়া', গ্রামের মধ্যে সর্বসম্মত প্রবীণ ব্যক্তি, যাকে সকলেই মেনে চলে।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে শুনলাম, আবদুল আজিজুল নামে এক যুবককে পাওয়া গেছে, তিনি আগামীকাল আমাদের গোসাইগাঁওয়ের শরণার্থী শিবিরগুলিতে নিয়ে যাবেন।

গোসাইগাঁও থেকে ধুবড়ি : শিবির পরিদর্শন

১৩ সেপ্টেম্বর কোকরাঝাড় থেকে শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে গাড়িতে চেপে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজিজুল স্থানীয় যুবক এবং কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউ–এর (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন) সক্রিয় কর্মী। ওঁর কাছ থেকে আমরা কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও সাব–ডিভিশনের ৩৫টা শিবিরের তালিকা পেলাম। এগুলো মূলত বাঙালি মুসলমান শরণার্থীদের শিবির। তালিকায় সত্তর থেকে আশি হাজার শরণার্থীর উল্লেখ রয়েছে। সকাল সাড়ে ন–টায় আমরা গ্রাহামপুর উচ্চ–মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিবিরে পৌঁছালাম। এটা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। আমাদের যাত্রাপথের সমস্ত শিবিরই স্থাপন করা হয়েছে অ–বড়ো গ্রামে। বেশিরভাগই মুসলমান গ্রাম। কিছু কোচ, রাজবংশী বা আদিবাসী গ্রামও আশ্রয় দিয়েছে। গোসাইগাঁও হয়ে ধুবড়ির শিবিরে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় দুপুর বারোটা বেজে গেল। বেশিরভাগ মানুষই এসেছে ২৪ জুলাই নাগাদ। আবালবৃদ্ধবণিতা পায়ে হেঁটে, নদী সাঁতরে, দৌড়ে এসেছে; যারা নৌকা বা গাড়ি পেয়েছে তারা ভাগ্যবান। মাঝে দিনেরবেলায় লোকে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছে। শরণার্থীদের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, দাঙ্গাকারীরা সাধারণত প্রাণে মারতে চায়নি, খেদিয়ে দিতে চেয়েছে। অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাওয়ার পরে ঘরে ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। খেতের ফসলও অনেক জায়গায় নষ্ট করা হয়নি। তবে ঘরের যাবতীয় জিনিস লুঠপাট করা হয়েছে।

বিকেল নাগাদ শ্রীরামপুর রেলস্টেশনের কাছে পৌঁছে আমরা 'আদিবাসী কোবরা মিলিটারি অফ আসাম'–এর চেয়ারম্যান জাবরিয়াস খাখা–র সঙ্গে দেখা করি। খাখা একজন বিনয়ী যুবক। কথা বললে বোঝা যায়, নেহাত আক্রমণের মুখে পড়েই এই যুবকেরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ দুবার আদিবাসীদের নৃশংসভাবে খেদানো হয়েছে। তবে পুনর্বাসনের পর ওরা সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পন করেছে।

সেদিন রাতে আমরা অবশ্য নিরাপদ একটা আশ্রয় পাই। আসাম কৃষি বিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অতিথিশালায় আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়।

---

১ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে ১৮৮৬ সালের 'আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন'–এর একটা সংশোধনী মারফত নতুন দশম অধ্যায় যোগ করে ট্রাইবাল বেল্ট অ্যান্ড ব্লক গঠন করা হয়। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হল, 'প্রোটেকশন অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস'। সংশোধিত আইনের ১৬৪(২)(বি) ধারায় রয়েছে, 'বেল্ট অ্যান্ড ব্লকে (ট্রাইবাল শব্দটা নেই) কোনো জমির মালিক সেই বেল্ট অ্যান্ড ব্লকের এমন কোনো লোকের কাছে তার জমি হস্তান্তর করতে পারবে না, যে ওই বেল্ট অ্যান্ড ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা, যে ১৬০ ধারায় বর্ণিত শ্রেণীর মানুষ নয়, *আগে ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদন পেলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে*'। ১৭১(২) ধারায় প্রোটেক্টেড ক্লাসেস বা সংরক্ষিত শ্রেণী বলতে 'নিম্নলিখিত শ্রেণীর চাষি, যেমন সমতলের জনজাতি, পাহাড়ি জনজাতি, চা বাগানের শ্রমিক, সাঁওতাল, নেপালি চাষি–গোচর এবং তফশিলি জাতি'র উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সমতলের জনজাতি বলতে বড়োর পাশাপাশি অন্যদেরও বেল্ট্স অ্যান্ড ব্লকসে জমির সংরক্ষিত অধিকার দেওয়া হয়েছে।

'বাংলাদেশি গো ব্যাক'

১৪ সেপ্টেম্বর আমি এবং রামজীবন ফের কোকরাঝাড় শহরে আসি। সকাল নটা-দশটা নাগাদ আমরা রুইসুমোই হোটেলে বসে আছি, কাজ শুরু করব ভাবছি। রাস্তায় দেখি সার সার গাড়ি বোঝাই যুবকেরা 'বাংলাদেশি গো ব্যাক' শ্লোগান দিতে দিতে শহরে ঢুকছে। গাড়ির মাথায় হলুদ পতাকা, মাঝে ঢাল-তরোয়াল ক্রস করে আঁকা। অনেকটা 'গোর্খাল্যান্ড' কায়দার ঝান্ডা। রামজীবনের মোবাইল ফোনে বিজয়কুমার ব্রহ্ম পরামর্শ দিলেন, আপনারা আবসুর জনসভায় চলে যান। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, কী করা যায়। গাড়ির স্রোত চলেছে। এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। গাড়ির স্রোত শেষ হওয়ার আগেই বিপরীত দিক থেকে মিছিল আসতে শুরু করল। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ইউনিফর্ম পরেই এসেছে মিছিলে, যুবক-যুবতীরাও রয়েছে। বৃষ্টি জোর হল, তার মধ্যেই উদ্দীপ্ত শ্লোগান দিতে দিতে ডিসি অফিসের দিকে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। সমস্ত শহরকে স্তব্ধ করে দিয়ে পাক্কা এক ঘণ্টা মিছিল চলল।

আমরা গেলাম 'বড়ো সাহিত্য সভা'র কার্যালয়ে। সেখানে তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। গেলাম শাসকদল 'বড়োল্যান্ড পিপ্‌লস ফ্রন্ট'-এর কার্যালয়ে। সেখানে কোকরাঝাড়ের মহিলা-বিধায়ক প্রমীলা রাণী ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এছাড়া 'বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল' বিটিসি-র একজন কর্মকর্তা রিও রেওয়া নার্জিহারি-র সঙ্গে কথা বলে ওদের মনের কথা আরও কিছুটা বোঝা গেল :

৩৮৯৫টা গ্রাম আছে বিটিসির মধ্যে। তার মধ্যে ট্রাইবাল কেন্ট্স অ্যান্ড ব্লক্সের মধ্যে আছে ২৭৫০টা আর তার বাইরে আছে মাত্র ৬০০টা গ্রাম। ফরেস্টে আছে ৫৫৪টা গ্রাম। ট্রাইবাল কেন্ট্স অ্যান্ড ব্লক্স ১৯৪৭ সালে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে ট্রাইবাল বাদে কয়েকটা প্রোটেক্টেড ক্লাস অফ পিপ্‌ল আছে। যেমন, রাজবংশী-নেপালি-আদিবাসী-বড়ো-গারো-রাভা এখানে থাকতে পারে। প্রোটেক্টেড ক্লাসের বাইরে এখানে কোনো নন-ট্রাইবাল থাকতে পারে না। অবশ্য বাঙালি, মাড়োয়ারি, বিহারিরা বিজনেস ক্লাসের মানুষ স্থানীয়, তখন থেকেই এদের আমরা রেখেছি। এদের থাকার মধ্যে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাইরের থেকে যারা এসেছে, তাদের এখানে কোনো থাকার অধিকার নেই। ২০০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চুক্তির আগে থেকে যারা এখানে ট্রাইবাল কেন্ট অ্যান্ড ব্লকের বাইরের গ্রামগুলোতে আছে, তারা তো আসাম সরকারের সময় থেকেই আছে। ২০০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির পরে যারা এসেছে, তাদের আমরা থাকতে দেব না। মুসলমানরা বেশিরভাগ ওই ৬০০ গ্রামে আছে। গোসাইগাঁওতে আছে, কোকরাঝাড়েও আছে। তখন তো আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল না। আসাম সরকার ম্যানিপুলেট করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ট্রাইবাল কেন্ট অ্যান্ড ব্লকের মধ্যেও মুসলিম আছে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আদিবাসীরা প্রোটেক্টেড ক্লাস। ওদের থাকার কোনো আপত্তি নেই তো?

— না।

— ওরা শিডিউল ট্রাইবের (এসটি) ডিমান্ড করেছে। আপনারা কি তা সমর্থন করেন?

— আমাদের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু রিজার্ভেশন কোটা, ১৬টা ট্রাইবাল গ্রুপের জন্য মাত্র ১০%, সেন্ট্রালে ৭%। রাজবংশী, আদিবাসী এসটি ডিমান্ড করেছে। ওরা এসে গেলে, আমাদের কোটা আরও কমে যাবে। তাই আমরা বলছি, ওদের জন্য একস্ট্রা রিজার্ভেশন করে ওদের এসটি-তে ঢুকিয়ে দাও। ওদেরও সুবিধা হবে, আমাদেরও সুবিধা হবে। কম-সে-কম ৫% বাড়ানো দরকার। বড়ো ছাড়া রাভা, গারো, হাজং, সনওয়াল কাছারি এরকম আরও কিছু এসটি-র মধ্যে আছে।

বঙ্গাইগাঁও থেকে চিরাং : শিবির পরিদর্শন

১৪ সেপ্টেম্বর রাতেই আমরা বঙ্গাইগাঁওতে চলে গেলাম। পরদিন প্রথমে আমরা গেলাম হাপাসরা গ্রামে। এখানেও আমরা সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান কর্মীকে পেলাম। বঙ্গাইগাঁওতে ১৫ আর চিরাংয়ে ১৭টা শিবির রয়েছে। বড়োভূমি থেকে যারা পালিয়ে ধুবড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে রয়েছে ৯৩টা শিবির। এখানে 'রিহাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন' নামে একটা সংগঠন ত্রাণের কাজ করছে। ৫ আগস্ট প্রকাশিত এদের সমীক্ষা অনুযায়ী, চিরাং-চাপর-বিলাসিপাড়া-বঙ্গাইগাঁও-কোকরাঝাড় (গোসাইগাঁও)-ধুবড়ি মিলিয়ে মোট আশ্রিত পরিবার ছিল ৬২,৪৩৬ এবং জনসংখ্যা ৩,২০,৭৬০। এদের হিসেবে ২০ জুলাই থেকে দাঙ্গায় আহতদের সংখ্যা ৬১৭ এবং মৃতের সংখ্যা ৬৩। এদের কাজে যথেষ্ট নিষ্ঠা রয়েছে। তবে এদের সমীক্ষা আংশিক। কারণ বড়ো বা অন্য জাতির ক্ষয়ক্ষতির কোনো হিসেব এর মধ্যে নেই। এটা ঠিক যে অ-মুসলমান এলাকায় এদের কাজ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মানুষকে নিয়ে সমীক্ষাদল গঠন করা দরকার।

গতকাল থেকেই বৃষ্টি চলছে। প্রায় দু-মাস হতে চলল শরণার্থী শিবিরগুলো রয়েছে। মূলত স্কুলবাড়িতেই শিবির তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কতদিন স্কুল বন্ধ থাকতে পারে? তাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে বহু জায়গায় প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ছোটো ছোটো তাঁবু বানিয়ে শরণার্থীরা বাস করছে। বৃষ্টি হলেই জল ঢুকছে সেই তাঁবুতে।

দুপুর দুটো নাগাদ আমরা পৌঁছালাম চিরাং জেলার লক্ষ্মীপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় সংলগ্ন শিবিরে। চিরাংয়ের ফরেস্টের লাগোয়া আটটা গ্রামের লোক এখানে আশ্রয় নিয়েছে। সার সার তাঁবু নামতে নামতে আই নদীর পার পর্যন্ত চলে গেছে। দুর্গতির শেষ নেই। একদিকে আকাশের জল, অন্যদিকে নদীর কূলছাপা জল — কে বাঁচাবে এদের?

এদিকে সরকার চাল, ডাল, সর্ষের তেলের ব্যবস্থা করেছে বটে, কিন্তু মেয়াদি পাট্টা (জমির পাট্টার পাকা কাগজ) না থাকলে এখনই পুনর্বাসন দেবে না। আরও শোনা যাচ্ছে, লোককে বাছাই করে তিন দফায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তার অর্থ হল, কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'বাংলাদেশি' ছেঁকে বার করে নেওয়া হবে! কোনো শিবিরের লোকই ভাগে ভাগে নিজের গ্রামে ফিরতে চায় না।

তিনটের সময় আমরা গেলাম চিরাংয়েরই কাউয়াটিকা শিবিরে। সেখানে দাঙ্গায় সন্তানহারা এক পিতার সঙ্গে দেখা হল। তাঁর মুখোমুখি বসে কথা বলতেই খারাপ লাগে। মহঃ বসের আলি নামে একজন এসে বললেন, চলুন আপনাদের একটা পোড়া গ্রাম দেখিয়ে আনি। মাজরাবাড়ি গ্রামে সার সার পোড়া তছনছ হয়ে যাওয়া ঘরগুলো দেখলাম। মাঠের ফসল কিন্তু নষ্ট হয়নি। দিনেরবেলায় ফসলের তদারকি করে মুসলমান শরণার্থীরা শিবিরে ফিরে আসে। বসের আলি নিজের গাছ থেকে এক মুঠো লেবু (কাগজি ধরনের) এনে আমাদের হাতে তুলে দেন। বড়োরা হামলা চালানোর পর নিজেরাও পাল্টা হামলার ভয়ে এই গ্রাম ছেড়ে দূরে সরে গেছে।

সামান্য উপলব্ধি : কিছু প্রশ্ন

বড়ো আর বাঙালি মুসলমান, সকলের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাই। উভয়েরই বুকে আক্রান্তবোধ আর ভয়। বড়োদের নিজভূমে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ভয়। মুসলমানদের পিঠে বাংলাদেশি ছাপ পড়ার ভয়।

কেবল মুসলমানদেরই বা কেন? যেভাবে গুয়াহাটি হয়ে সমস্ত উত্তর–পূর্বাঞ্চলে 'বাংলাদেশি' খেদানোর আওয়াজ উঠেছে, যে কোনো বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারছে?

শোনা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলের আদিম অধিবাসী ছিল বড়োরা। ওরা বলে, খিলঞ্জিয়া, ভূমিপুত্র। ভারতীয় সমাজের কৃষিজীবী মূলস্রোতে তারা মিশে যেতে পারেনি। ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকার সেচ–সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা ক্রমশ জঙ্গল এলাকায় সরে যেতে থাকে। তাদের মধ্যে পুরোনো ধরনের ঝুম–চাষ বহাল থাকে। পরে ব্রিটিশ শাসকেরা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষিদের এখানে বসবাসে উৎসাহী করে তোলে। অন্যদিকে ব্রিটিশ চা–বাগিচা মালিকেরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা থেকে আদিবাসীদের এখানে নিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় বড়োরা ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে 'ট্রাইবাল লিগ' ট্রাইবাল ল্যান্ডের প্রোটেকশন দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার 'লাইন সিস্টেম' চালু করে। একটা কাল্পনিক লাইন টেনে কিছু কিছু জেলায় অভিবাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সফল হয়নি। স্বাধীনতার পর 'ট্রাইবাল বেল্টস অ্যান্ড ব্লক্স'–এর দাবি তোলা হয়। সেই মর্মে আইনও সংশোধন হয়। কিন্তু কখনোই বাইরের অভিবাসন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।

ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক হতেই পারে। কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত সফরে 'বাংলাদেশি খেদাও' আওয়াজের গভীরে বড়োভূমিতে ভূমির অধিকার নিয়ে একটা তীব্র টানাপোড়েন আমরা অনুভব করেছি। আজকের দাঙ্গা কি তারই নির্মম পরিণতি নয়?

বড়োভূমিতে দাঙ্গার দিনলিপি

গুয়াহাটি, শিলচর ও ডিব্রুগড় থেকে বাংলায় প্রকাশিত 'দৈনিক যুগশঙ্খ' পত্রিকা থেকে নেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে এই দিনলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণত যে কোনো দাঙ্গার মোটাদাগের খবর থেকে নানারকম ভুল ও একপেশে ধারণার সৃষ্টি হয়। সেই ধারণাগুলিকে অনেকসময় রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারও করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশের রাজনীতির জাতীয়, আঞ্চলিক, ভাষা ও কৌমগত ভিন্ন ভিন্ন তল রয়েছে, ভ্রান্তি থেকে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। বড়োভূমির সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও এরকম বিভ্রান্তির উৎস হয়ে উঠতেই পারে। সর্বোপরি, আসাম তথা উত্তর–পূর্বাঞ্চলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। তাই আমরা এই দিনলিপি প্রকাশ করছি।

১৯ জুলাই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা মাত্র কয়েকদিন আগে গোঁসাইগাঁওয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুজনকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এই ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস (বিটিএডি) এলাকায়।

'অসম তফশিলি জাতি পরিষদ'–এর ডাকা ২৪ ঘন্টা বন্‌ধ চলাকালীন আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ কোকরাঝাড় সদরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা সমবেত মুসলমান জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে 'অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (আমসু)–র নেতা মহিবুল ইসলাম ও সিদ্দিক আলি গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকে কোকরাঝাড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কাতারে কাতারে লোক রাজপথে বেরিয়ে আসে। আহত দুজনকে কোকরাঝাড় রূপনাথ ব্রহ্ম অসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে এসে জড়ো হয় সহস্রাধিক মানুষ। কোকরাঝাড় জেলার কাজিগাঁও থানার ধুবড়ি–কোকরাঝাড় সীমানা সংলগ্ন মঙ্গলাঝোড়ার গভীর জঙ্গলে এদিন দুপুরে সেনা ও পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালায়। সন্ধ্যা সাড়ে ছ–টা নাগাদ ধরা পড়ে 'রাভা ভাইপার আর্মি' (আরভিএ)–র রুদ্র আভা (৩০)। পুলিশি সূত্রে জানা যায়, তিনি একবার 'বড়ো লিবারেশন টাইগার' (বিএলটি) জঙ্গি হিসেবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারপর ফের তিনি 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বড়োল্যান্ড' (এনডিএফবি)–তে যোগ দিয়ে তিন মাসের জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেন ভুটান থেকে। এখন তিনি আরভিএ–র হয়ে কাজ করছেন।

৬ জুলাই কোকরাঝাড় জেলার আন্ঠিহারা মুসলমানপাড়া গ্রামে ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় কিছু মুসলমান মানুষ দোকানের সামনে বসে আড্ডা মারছিল। মোটরসাইকেলে এসে একে–৪৭ দিয়ে গুলি করে চলে গেল। একজন ওখানেই মারা গেল, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হল, একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেল। আহতদের বয়ান অনুযায়ী, যারা মেরেছে ওরা বড়ো জাতির লোক ছিল। এটা নিয়ে উত্তেজনার সূত্রপাত। নিহতদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আসাম পুলিশের তদন্তও চলছিল। তদন্তকারী অফিসারদের কথার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের একটা তফাত চলে এসেছিল। তদন্তকারী অফিসাররা বলে, এটা কেএলও–র কাজ। আহত ব্যক্তিরা এই তথ্য মেনে নিতে পারেনি।

স্বপন আইচ, সাংবাদিক, শ্রীরামপুর, গোসাইগাঁও

২০ জুলাই আজ শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ কোকরাঝাড় শহর থেকে তিন কিমি দূরে নাড়াবাড়ির জয়পুরে মোটরবাইক আরোহী চার প্রাক্তন বিএলটি সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তারা বাইক জ্বালিয়ে দেয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলে আক্রান্ত হয়। এদিন আমসু এবং এবিএমসু (অল বড়োল্যান্ড মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) ঘোষণা করে, তারা বিটিএডি এলাকা ও ধুবড়িতে ২৩ জুলাই সকাল পাঁচটা থেকে ১২ ঘণ্টা বন্‌ধ পালন করবে।

২১ জুলাই আজ শনিবার ভোররাতে তিনটে নাগাদ কোকরাঝাড় থানা থেকে আট কিমি দূরে চিম্বরগাঁওয়ের হালিথবাড়িতে অপরিচিত আততায়ীর গুলিতে একজন কৃষক নিহত হন, আহত হন তাঁর স্ত্রী সহ পাঁচজন। জেলার ফকিরাগ্রাম, গোঁসাইগাঁওয়ে এবং চিরাং, বাকসা ও ওদালগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং ১৪৪ ধারা জারি হয়। বিটিএডি প্রধান হাগ্রামা মহিলারি বলেন, 'অশান্তি দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র'।

এদিন শালকোচা থেকে কোকরাঝাড় হয়ে একটি ইটভর্তি ট্রাক যখন শালাকাটি যাচ্ছিল, আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে। এই সুযোগে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালায় চালক ও মালবাহী শ্রমিক জাকিরের ওপর। চালক পালিয়ে গেলেও জাকির মারা যান।

দুপুর বারোটা নাগাদ গোসাইগাঁও মহকুমার মাকটাই গ্রামে উন্মত্ত যুবকেরা গুলি চালায়। একজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ আহত হয়।

২২ জুলাই গতকাল রাতে কোকরাঝাড় শহরের প্রাণকেন্দ্রে 'গঙ্গা টকিজ' সিনেমাহলের পাশে ভাড়াবাড়িতে থাকা এক পরিবারের ওপর নৃশংস হামলা হয়। পরিবারের গৃহকর্তা, স্ত্রী ও নিকটাত্মীয় মারা যায়। পার্শ্ববর্তী গোরাং নদীতে লাশ ফেলে দেওয়া হয়। ভোররাতে গোরাং নদীতে মাছ ধরতে আসা একদল জেলে দশ বছরের এক গুলিবিদ্ধ শিশুকে উদ্ধার করে। আখতার নামের এই শিশুকে কোকরাঝাড় আরএনডি সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। শ্মশানঘাটের পাশে দুপুরে দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তাদের শনাক্ত করা হয় বসিরন খাতুন (১৫) ও রুকসানা খাতুন (৫ মাস)। গতরাতে মোটর পার্টস দোকানের কর্মচারী মনোয়ার হুসেনের (৪০) ভাড়াঘরে হামলা হয়। বালাজান তিনআলিতে অরুণ দাসের স্ত্রী পূর্ণিমা দাসকে মুসলমান মনে করে আক্রমণ করা হয়।

চিরাং জেলার বিজনি অঞ্চলের মঙ্গোলিয়ান বাজারে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে হাসের আলি ও নূর হুসেন নামে দুজন মারা যান।

গতকাল শনিবারের কার্ফু কোকরাঝাড়ে রবিবারও চলতে থাকে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত। কোকরাঝাড় মহকুমায় ৭টি এবং গোসাইগাঁওয়ে ৬টি আশ্রয়শিবির তৈরি হয়, আশ্রয় নেয় মোট চোদ্দো হাজার মানুষ।

আজ রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সেরফাংগুড়ির আঠিয়াবাড়িতে ৪ জন হিন্দিভাষী পরিবারের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

গোসাইগাঁও মহকুমার কচুগাঁওয়ে মসজিদ ভাঙচুর হয়।

ফকিরাগ্রাম থানার কোদালদোয়াতে এক অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরে পাঁচ হাজার বড়ো মানুষ আশ্রয় নেয়। ভাওতাগুড়ি ফাঁড়ির অন্তর্গত মান্দারপাড়াতে শিবিরে আশ্রয় নেয় প্রায় দু-হাজার মুসলমান মানুষ। শাপকাটা ফাঁড়ির ভোমরাবিলের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে কাশিয়াবাড়ি সহ কয়েকটি গ্রামের মুসলমান মানুষেরা আশ্রয় নেয়।

কোকরাঝাড় থেকে ধুবড়ি যাওয়ার পথে পুলিশের কনভয়ে হামলা চলে, জনতা পাথর ছোঁড়ে।

এদিনের সরকারি হিসেবে ১৭ জন মৃত, আহত ২০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২৩ জুলাই কোকরাঝাড় জেলার গ্রামগুলি ছেড়ে পালাচ্ছে ভীত শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা। ঘরবাড়ি জ্বলছে। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ এবং নতুন করে কার্ফু জারি হয় বিটিএডি এলাকার বাইরে ধুবড়ি, গৌরীপুর ও সাপটাগ্রামে এবং চিরাং জেলাতে। লাঠি বল্লম দা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে আসে জনতা।

গোরাং নদীতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ। মুনসিরঘোপ এলাকায় জমিলা বেগম (৪৫) আহত, করিম মিয়া (৫৫) গুলিতে ঝাঁঝরা। জেলার আমিনকাটা, সুবনখাতা, লক্ষ্মীগাঁও ও কচুকাটা গ্রামে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়েছে।

এদিন সরকারি মতে ১৫ জন মৃত। বেসরকারি হিসেবে ৩০ জন মৃত। অসমর্থিত মতে চল্লিশের বেশি মৃত। কোকরাঝাড়ে ৪২টি আশ্রয়শিবিরে সত্তর হাজারের বেশি মুসলমান মানুষ।

আজ সকাল থেকে ধুবড়িতে বন্‌ধ ডাকে আমসু ও এবিএমসিইউ। গৌরীপুর বাজারে অরাজক পরিস্থিতি, শাসানি দিয়ে বন্‌ধ সফল করা হয়। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধুবড়ি শহরের ১০নং ওয়ার্ডে ব্রহ্ম বোর্ডিং হস্টেলের তিনটি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নিউ জলপাইগুড়ি-ধুবড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধুবড়ি অভিমুখে আসার পথে গৌরীপুর স্টেশনে দুষ্কৃতিরা কণিষ্কা রাভা (২১) এবং কামেশ্বর রাভা (২৩) নামে দুই যুবককে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে। এই জেলার ২৬টি শিবিরে ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ আশ্রয় নেয়।

কোকরাঝাড় জেলার সীমান্তবর্তী চিরাং জেলার জরেগাঁও, কাউনিয়াভাষা, মিলমিলিপাড়া, খাগ্রাবাড়ি, কুর্শাকাটি, তিরিমারি প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের মহিলাদের দেখা যায় বাড়িঘর ছেড়ে কোলের শিশু নিয়ে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

২৪ জুলাই আজ কোকরাঝাড়ের কদমতলায় শাহিনুর আলম (১৯) নিহত হয়। দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলেটি বিটিএডি এলাকার বাইরে বঙ্গাইগাঁও জেলার চাকলা গ্রাম থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য একটি নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে কোকরাঝাড়ে এসেছিল শনিবার। তাকে অপহরণ করা হয়েছিল।

কোকরাঝাড় মাগুরমারির সুলেমান শেখ (২৬) নিরুদ্দেশ। বাসুগাঁওয়ের বাসিন্দা কাঠমিস্ত্রি গোপাল দাস (৪৭) কাজ করতে এসে বিসমুতিয়ারি গ্রামের একদল উন্মত্ত যুবকের হাতে প্রাণ দেন।

গোসাইগাঁও সংলগ্ন হামরাবাড়ি গ্রামের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মিনা বেগম, দাদা নাসিরুদ্দিন (২৩) ও ঠাকুমা কারমান বিবি (৭৪) নিহত হন। তার বাবা আবুল কাসেম বাড়িতে ছিলেন না। তিনি মিস্ত্রির কাজ করেন গুয়াহাটিতে।

সোমবার শ্বশুর, শাশুড়ি ও সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে বঙ্গাইগাঁও শহরের দিকে পালিয়ে আসার পথে এক মহিলা প্রসব যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বঙ্গাইগাঁও

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার সন্ধ্যা থেকে চিরাং জেলার উত্তরাঞ্চলের মানুষ প্রাণভয়ে কাজলগাঁও, ঢালিগাঁও, বিজনি, বঙ্গাইগাঁও ইত্যাদি সুরক্ষিত এলাকায় পালিয়ে আসে। দুর্বৃত্তরা আজ মঙ্গলবার দুপুরে কাজলগাঁও মহকুমায় অন্থাইবাড়ি, দেউলগুড়ি, ডোমগাঁও, পাটাবাড়ি সহ বেংতলের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। কাকভোরে বিজনি থনার করাইবাড়ি, গেন্দাবাজার, কুক্‌লং ইত্যাদি বড়ো অধ্যুষিত গ্রাম জ্বলতে থাকে।

বঙ্গাইগাঁও জেলার মানিকপুর থানায় বড়ো অধ্যুষিত দাখাতি, জামদোহা, ডোকারচক বাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাসুগাঁও থানায় খাটালপাড়া, শিলপাট ও পাখরিগুড়ি গ্রামে মুসলমানদের ৪০টি ঘর জ্বলে। বাসুগাঁও থানা ও সালেকাটি পুলিশ ফাঁড়ির খাগ্রাবাড়ি, জরেগাঁও, টিলাপাড়া, উজানপাড়া, মাঝপাড়া, কাউনিয়াভাষা, মৌজাবাড়ি, কচুদোলা, দেউলগুড়ি, উলুবাড়ি, শিলপাট গ্রামের পাঁচ হাজারের বেশি মুসলমান ঘর ছেড়ে বাসুগাঁও উচ্চতর বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেয়। তিরিমারি, টেংনামারি, ফুলগুড়ি, খাগ্রাবাড়ি, নলবাড়ি, থুরিবাড়ি, শরাইখসরা, তিলকগাঁও, বরসরা গ্রামের তিন হাজারের বেশি বড়ো ও রাজবংশী মানুষ বাসুগাঁও কলেজে আশ্রয় নেয়। জেলায় কার্ফু চলছে।

গুয়াহাটি অভিমুখে আসা ৪০টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের কামরায় খাদ্য, পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়; বিদ্যুৎ পরিষেবা, এসি ইত্যাদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গোসাইগাঁওয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে হামলায় এক যাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

বিটিএডি প্রধান হাগ্রামা মহিলারি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে আসছে দুর্বৃত্ত'। সরকারি সূত্রে মৃতের সংখ্যা ২৬।

২৫ জুলাই কোকরাঝাড়ের ডিমলগাঁওয়ের মাছুয়াঘাটে বুধবার সন্ধ্যায় তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিন সকালে নিরাপত্তা বাহিনী দুটি ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে। এর মধ্যে বড়োবস্তির দণ্ডি বসুমাতারিকে (৬৫) শনাক্ত করা হয়। কোকরাঝাড়ের আলুভূঞা গ্রামের মুসলমান বাসিন্দা ভাসা দেওয়ান বড়ো পড়শি রাজেন্দ্র ও আরতি বসুমাতারিকে আশ্রয় দিলেন উন্মত্ত হামলার সময়।

আজ ভোরে চিরাং জেলায় বাসুগাঁও থানার অন্তর্গত বাসুগাঁও–কাকারাগাঁও সড়কের কানিভুর সেতুর নিচে আতাউর রহমান নামে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৌজাপাড়া গ্রামে জয়তুন নেছার (৫০) মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

ধুবড়ি জেলায় নতুন নতুন এলাকায় দাঙ্গা লাগে। ফের অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারি হয়।

সরকারি মতে মৃত বেড়ে ৪৩; কোকরাঝাড়ে ২৫, চিরাংয়ে ১৫। ১২১টি শরণার্থী শিবিরে এক লক্ষ সত্তর হাজার মানুষ। ২৯ কোম্পানি আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন হয় ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও ও বিটিএডি এলাকায়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মিজারুল কায়েস বলেন, 'অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনায় রাজি ঢাকা'।

২৬ জুলাই বাকসা জেলায় হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। কোকরাঝাড়ে পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই জেলায় মৃত ৩৩, চিরাংয়ে ১৭। সরকারি মতে মোট নিহত ৪২, আহত ৪৫, নিখোঁজ ১০, গ্রেপ্তার দেড় শতাধিক। তিন জেলায় আড়াইশোটির বেশি শিবির, তিন লক্ষাধিক আশ্রিত। ধুবড়ি জেলার তামাহাট, বিলাসীপাড়া, গৌরীপুর এবং ধুবড়িতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার শরণার্থী।

ধুবড়ি সার্কিট হাউসে এআইইউডিএফ (অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) সুপ্রিমো তথা ধুবড়ির সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেন, 'বড়োভূমিতে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে'। তিনি বলেন, বিটিসি এলাকায় বসবাসকারী ৭০ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোককে ধ্বংস করে ২২ শতাংশ বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকের জনসংখ্যা দিয়ে বৃহত্তর বড়োল্যান্ড গঠন করার পথ মসৃণ করার পরিকল্পনা চলছে।[২]

চিরাং জেলায় কুকুরমারা গ্রাম ও শুকলাইপাড়া, কামারপাড়া, ঢাকুয়ানা এলাকায় স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে রাতপাহারা দেওয়া হয়, শান্তি অব্যাহত থাকে।

২৭ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেন, 'বড়োভূমিতে অবড়োদের অধিকার সুরক্ষিত, তাদের জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না।'

২৮ জুলাই বরঝাড় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে এআইইউডিএফ স্মারকলিপি দেয় : বিটিএডি–তে ৭১% অবড়ো, ২৯ বড়ো; বিটিসি ভেঙে দাও।

বোড়োল্যান্ডে দিনহাজিরা–শ্রমিক, কসাই, রিকশাচালক, ঠেলাচালক, গৃহপরিচারিকা অধিকাংশ মুসলমান। এইসব শ্রমিকের অভাবে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। আশ্রয়শিবিরে মোট আড়াই লক্ষ শরণার্থী।

২৯ জুলাই গোসাইগাঁও মহকুমার হাসরাবাড়ি থেকে রাজু আলি, কোর্শামারি গ্রাম থেকে খোদা ভাষা শিকদার (৩০), ভাওলিগুড়ি থেকে রহিমা বিবির (৫০) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। চিরাংয়ে কার্ফু উঠল। ঘরমুখী আক্রান্ত পলাতক মানুষ। জেলার ৮৩টি শরণার্থী শিবিরে ১,১২,৮৫১ জন। ৮৩টি গ্রামের ২৬,১৯০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত। আগুনে ছাই ১১৬০টি ঘর।

১ আগস্ট সরকারি মতে ২৭৮টি শিবিরে মোট শরণার্থী ৪.০৬ লক্ষ। ধুবড়ি জেলার ১১৮টি শিবিরে সকলেই মুসলমান। এই জেলার ধুবড়ি, গৌরীপুর, গোলকগঞ্জ, তামারহাট,

---

২ বিটিসি নিয়ন্ত্রিত বিটিএডি এলাকায় অবড়োদের আন্দোলনের একটি দাবি, ৫০ শতাংশের কম জনসংখ্যার বড়ো কিংবা জনজাতির গ্রামগুলিকে বিটিএডি–র বাইরে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ২০০৩ সালের চুক্তির ৩.১ দফা অনুযায়ী তা সম্ভব নয়। সেখানে রয়েছে, একের পর এক (কন্টিনিউ) অবড়ো অধ্যুষিত যে কোনো গ্রাম ঢুকতে পারে বিটিএডি–তে।

বিলাসীপাড়া ও চাপর থানার অন্তর্গত এলাকায় রাত দশটা থেকে সকাল ছ–টা পর্যন্ত কার্ফু জারি রয়েছে।

২ আগস্ট চিরাং জেলার চৌরাবাড়ি গ্রামের দুষ্কৃতীরা বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ৯টি বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেখানে স্থানীয়দের ঘরে ফেরার প্রস্তুতি চলছিল।

৩ আগস্ট রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত কার্ফু চলাকালীন কোকরাঝাড় শহরের কলেজ রোডে ঠিকাদার জি এস খানের বাড়িতে লুটপাট হয়। সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক এম রহমানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দুষ্কৃতীরা।

৫ আগস্ট চিরাং জেলার বিজনি মহকুমা থেকে উদ্ধার হয় আবদুস সালাম ও তাঁর দুই শিশুপুত্রের মৃতদেহ। এরা তিনজন দাঙ্গার প্রথমদিকে চিরাংয়ের কাওয়াটিকা গ্রামের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। চিরাং কোকরাঝাড় সীমান্ত সংলগ্ন বাড়ন্তপুর গ্রামে চম্পানদীর তীরে পুঁতে রাখা ছিল দুটি মৃতদেহ। গতকাল অপহরণ হয়েছিলেন ইসলাম মণ্ডল ও আমির আলি নামে দুই যুবক। আজ সকাল ৮টা নাগাদ ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় জনতা। বড়োল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের যাত্রীবাহী বাসে উঠে মারধোর করা হয়।

কোকরাঝাড় শহর থেকে প্রায় ৭ কিমি দূরের জালোয়াবাড়ি চাবাগানের আদিবাসী লক্ষ্মণ বেক (১৯)। অন্য যুবকদের সঙ্গে হালের বলদ জোগাড়ে বেরিয়েছিল সে। চাবাগানে লুকিয়ে থাকা এক দুর্বৃত্ত এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। আহত হয় লক্ষ্মণ বেক। এই ঘটনায় সকালে জালোয়াবাড়ি চাবাগানের ৫০০ শ্রমিক হাতে লাঠি তীর ধনুক নিয়ে পাল্টা আক্রমণে উদ্যত হয়। এক বিবৃতি জারি করে 'সারা অসম আদিবাসী ছাত্র সংস্থা'র কোকরাঝাড় পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি জানায়, বিটিএডি–র বড়ো মুসলমান সংঘর্ষের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জড়িত করার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক।

৬ আগস্ট সরকারের ইঙ্গিত : 'জমির পাট্টা, সরকারি নথি বাধ্যতামূলক হতে পারে পুনর্বাসনে'।

৭ আগস্ট সোমবার রাতে ধুবড়ি-কোকরাঝাড় সীমান্তবর্তী রানিঘুলিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর হাতে ৩ জন নিহত হয়, গুরুতর আহত হয় ২ জন। মঙ্গলবার অগ্নিগর্ভ বিলাসীপাড়া, গৌরীপুর শহরের নিকটবর্তী সুরিয়াতলিঘাট, বটেরতল, আলমগঞ্জ এলাকা। ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ হয় বেলতলি এলাকায়। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারি হয় ধুবড়ি, গৌরীপুর, গোলকগঞ্জ, তামারহাট, বিলাসীপাড়া ও চাপর থানা এলাকায়।

পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় সোমবার অবধি ১.১৬ লক্ষ মানুষ শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে গেছে। শিবিরের সংখ্যা ৩৪০ থেকে কমে ২৪৫ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেন, 'অবৈধ নাগরিকদের পুনর্বাসন সরকারও চায় না। যেসব প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক স্থানচ্যুত হয়েছে, তারাই পুনর্বাসন পাবে। শিবিরে থাকলেও সব লোকই যে পুনর্বাসন পাবে, তা নয়। চিরাংয়ের শিবিরে তো বহু বাইরের লোক রয়েছে। বাইরে থেকে অনেকেই এসে শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তবে বিটিসি এলাকায় যারা স্থানচ্যুত হয়েছে, তারাই পুনর্বাসন পাবে। ... জমি না থাকলে, ঘর না থাকলে কী করে পুনর্বাসন পাবে? ঘরবাড়ি থাকতে হবে, তবেই তো ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। তাছাড়া ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।'

সরকারি মতে, মৃত ৭৩, ঘর জ্বলেছে ৫৩৬৭টি, গ্রেপ্তার ১৭০ জন, নথিভুক্ত মামলা ৩০৯টি, মোট শরণার্থী শিবির ৩৪০টি, বর্তমানে ২৪৫টি। শিবিরে ৪,৮০,৬৬৪ জন ছিল, এখন ৩,৬৪,০৮৩ জন, ছেড়ে চলে গেছে ১,১৬,৫৮১ জন, শিবির বন্ধ হয়েছে ৯৫টি, শিবিরে মৃত্যু ১৫ জনের (৭ শিশু, ৮ বৃদ্ধ)।

৮ আগস্ট কোকরাঝাড় জেলায় ২, বাকসা জেলায় ২, মোট ৪টি মৃতদেহ উদ্ধার। কোকরাঝাড়, চিরাং, বাকসা ও ধুবড়ি জেলায় নৈশকালীন কার্ফু।

৯ আগস্ট বুধবার রাতে চিরাং জেলার ঢালিগাঁও থানা তথা ডাংতল সাব পুলিশ স্টেশনের নিলিবাড়ির আমসুর শাখা কার্যালয়ে আগুন লাগায় দুর্বৃত্তরা।

২৩ আগস্ট কোকরাঝাড়ের বিধায়ক প্রদীপ ব্রহ্ম গ্রেপ্তার বুধবার মধ্যরাতে দোতমার বাড়ি থেকে। শিবিরে আশ্রিতা এক মহিলা সোনিয়া গান্ধীকে এই তথ্য জানান। প্রতিবাদে কার্ফু উপেক্ষা করে কোকরাঝাড়, গোসাইগাঁও, ডাংতল সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ, রেল অবরোধে আওয়াজ ওঠে 'বাংলাদেশি হটাও, ভারত বাঁচাও'।

আগে প্রায় ৪.৯ লক্ষ শরণার্থী, বর্তমানে ২.৫৬ লক্ষ।

আসু জানায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে আসা পুনর্বাসন নয়।

২৪ আগস্ট আজ বাসুগাঁও সংলগ্ন কোকরাঝাড়ের তিনটি বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কোকরাঝাড় জেলার ছালাকাটি থানার কান্দিপুকুরির মিলমিলিপাড়ায় শুক্রবার দুপুরে বাইরে থেকে এসে হানা দেয় তিনজন দুষ্কৃতী। গ্রামে প্রবেশ করেই তারা পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালায় গ্রামবাসীরা, আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী জারেগাঁও–টিলারপার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয়শিবিরে। চিরাং জেলার বিজনি এলাকার বল্লমগুড়িতে সকাল দশটায় দুষ্কৃতীর প্রাণঘাতী আক্রমণে আহত হন নাসির উদ্দিন (৫৪)। পাশের গ্রাম পুরদিয়া থেকে চারজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁকে বঙ্গাইগাঁও সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৫ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চিরাং জেলার বিজনি থানার মালিপাড়ার চৌধুরিপাড়ায় আক্রমণের মুখে পড়েন মুসলমান সম্প্রদায়ের ছয়জন যুবক। আমগুড়ি শরণার্থী শিবির থেকে মোটরগাড়িতে বিজনি অভিমুখে আসার সময় এই হামলায় নিহত হন রাজাপাড়ার নুরজামান

মণ্ডল (৩০), জহিরুদ্দিন মণ্ডল (২০), আমণ্ডড়ির মনসুফ আলি মণ্ডল (১৮), বাঁশপাড়ার সিকন্দর শেখ (২৪), রতিক শেখ (২৮) এবং সরভোগ জামাদরবাড়ির আফজল মণ্ডল (১৯)। জেলায় রাতের কার্ফু থাকাকালীন এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দুজন এখনও নিখোঁজ। জেলায় নতুন করে অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারি হয়েছে। বদরুদ্দিন আজমলের গ্রেপ্তারির দাবিতে বজরঙ দল সোমবার ১২ ঘণ্টার অসম বন্‌ধ ডেকেছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমর্থন করেছে।

২৬ আগস্ট শনিবার গভীর রাতে কোকরাঝাড় জেলার সালেকাটিতে একদল দুর্বত্তের সশস্ত্র হামলায় চারজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ছয় বছরের শিশু সামিরুন খাতুন, ফুলবানু বেগম (৩৫), মহরুদ্দিন মণ্ডল (৩৫), মনোয়ারা বিবি (২৬)। সালেকাটি হাইস্কুল এলাকার বাসিন্দা ওই চারজন ধুবড়ি যাওয়ার জন্য সালেকাটি রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে স্টেশনরোডে শনিবার রাত সওয়া তিনটে নাগাদ আক্রান্ত হয়। কুকরি দিয়ে আঘাত করে হামলাকারীরা। পুলিশ চারটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে।

কোকরাঝাড় জেলার ১নং পর্বতঝোরা মহকুমার কাজিগাঁও পুলিশ থানার অন্তর্গত নটকোবাড়ি এলাকার শুকানঝোরা গ্রামে এক মুসলমান মানুষের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ধুবড়ি জেলার মাক্রিঝোরা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী জনতা আজ দুপুর আড়াইটা নাগাদ মাক্রিঝোরায় ৩১নং জাতীয় সড়ক দু'ঘণ্টা অবরোধ করে। জানা গেছে, মাক্রিঝোরা বানিয়ামা চতুর্থ খণ্ডের বাসিন্দা বিশু প্রাথানিক গতকাল থেকে নিখোঁজ। শুকানঝোরা গ্রাম থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

গতকাল মালিপাড়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কয়েক হাজার শরণার্থী এবং স্থানীয় মানুষ গড়েমারির কাছে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালীন চিরাং বন্‌ধের ডাক দিয়েছে এবিআমসু।

২৭ আগস্ট বিজনির মালিপাড়ায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ৪৮ ঘণ্টা পরেও অপরাধীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে না পারার প্রতিবাদে আজ সকাল পাঁচটা থেকে বিজনি রেলস্টেশনে এবিআমসুর নেতৃত্বে কয়েক শতাধিক মানুষ রেল অবরোধ করে। এদিকে বজরঙ দলের বন্‌ধে রাজ্য স্তব্ধ হয়ে যায়। ধুবড়ি জেলার ধুবড়ি সদর মহকুমার গোলকগঞ্জ এবং আগমনিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করার অভিযোগে পুলিশ পাঁচশোর অধিক বন্‌ধ সমর্থককে গ্রেপ্তার করে।

কোকরাঝাড় জেলার ফকিরাগ্রামে রাত ন-টা নাগাদ পঞ্চাশ জনের এক সশস্ত্র দুর্বৃত্তের দল সেনা-পোশাকে মুসলমান এলাকায় ভয়ানক হামলা চালায়। ফকিরাগ্রামের পাথরিতল এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গ্রাম ঘেরাও করে গ্রেনেড ও মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় দুর্বৃত্তরা। তারা পাথরিতল গ্রামটিকে ঘিরে রেখে পঞ্চাশ-ষাটটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সেখানে হামলাবাজ দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তাদের প্রায় দেড় ঘণ্টা গুলির লড়াই চলে। এ নিয়ে ফকিরাগ্রাম, গোসাইগাঁও এবং কোকরাঝাড় শহরে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। কোকরাঝাড়ের সালেকাটির চারটি গ্রাম নলজিবাড়ি, ভুমকি, চৌটকি ১ ও ২নং খণ্ড এবং বল্লমগুড়িতে সশস্ত্র জঙ্গিরা একই কায়দায় ছয়টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হামলা চালিয়েছে। ভাওড়াগুলির বিল্লাখাতাতেও একই রকমের গ্রেনেড হামলা ও গুলি চালানো হয়েছে। এই তিনটি স্থানে প্রায় একই সময়ে হামলা হয়।

চিরাং জেলার বাসুগাঁও থানার বেশ কয়েকটি এলাকায় আড়াই হাজার শরণার্থী তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল ২৫ আগস্ট। কিন্তু মাত্র দু-দিন পরই তাদের ফের শরণার্থী শিবিরে চলে যেতে হয়। বড়ো হুমকিতে পুলিশ প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয়।

২৮ আগস্ট আমসুর ডাকা অসম বনধে ব্যাপক হিংসা, রক্তপাত, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কালিমালিপ্ত হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিলনভূমি হিসেবে খ্যাত বরপেটা রোড। মঙ্গলবার সকালের দিকে একাংশ বন্‌ধ সমর্থক বেলতলায় বলপূর্বক দোকানপাট বন্ধের চেষ্টা করলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের বাকযুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি দুষ্টচক্র মুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেসময় ছয়-সাতশোজন দুষ্কৃতীর একটি দল হাতে হাতে দা, বল্লম, রড, লাঠি ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র নিয়ে ভাষিক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বেলতলায় হানা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্র মণ্ডল (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। এলাকার ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হয়ে তারা পঁয়ত্রিশটিরও বেশি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অতর্কিত হামলায় দু-পক্ষের অন্তত পঞ্চাশের বেশি মানুষ আহত হয়।

বন্‌ধ আহ্বানকারীদের তাণ্ডবে নগাঁও জেলার স্থানে স্থানে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমবাগান এলাকায় বন্‌ধ সমর্থক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত বন্‌ধ আহ্বানকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায়। আমবাগান থানার ২৬টি গ্রামে অনির্দিষ্টকালীন কার্ফু জারি করে প্রশাসন। পুব সোয়ালনি গ্রামের তিনশো হিন্দু বাঙালি পরিবার প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে মঙ্গলবার রাতে কলিয়াবরের খামখোয়া প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এর আগে ওই গ্রামের চারটি হিন্দু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা।

শিবসাগরে বন্‌ধ সমর্থকদের সঙ্গে সাংবাদিকও পুলিশের হাতে মার খেলেন।

২৯ আগস্ট বড়োল্যান্ডে অবৈধ মারণাস্ত্র বাজেয়াপ্ত ও জঙ্গি বিরোধী

অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের হাতে নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে, আলোচনাবিরোধী এনডিএফবি জঙ্গিগোষ্ঠী এবং একাংশ প্রাক্তন জঙ্গি বড়োল্যান্ডের হিংসায় মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ যেসব মৃতদেহ মিলেছে, সবাই অবৈধ মারণাস্ত্রের শিকার। গত সোমবার ফকিরাগ্রামের পাখরিতল সহ কোকরাঝাড় জেলার চারটি স্থানে দুষ্কৃতীরা নির্বিচারে গুলি ছুঁড়েছে, তাতেও ব্যবহার করা হয়েছে অবৈধ অস্ত্র।

৩০ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আজ ঘোষণা করেছেন, আগামী দু–তিন মাসের মধ্যে শুরু হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে ৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে নাগরিকপঞ্জি প্রস্তুত করার কাজ। ২০০৫ সালের ৫ মে আসু–র সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। কিন্তু ২০১০ সালের ২১ জুলাই বরপেটায় নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী জনগণের ওপর পুলিশের গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই বন্ধ রয়েছে নাগরিকপঞ্জির কাজ।

আগামী এক মাস বন্ধ করার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি।

২৮ আগস্ট আমসু–র সদস্যদের হাতে সাংবাদিক প্রহারের প্রতিবাদে গৌহাটির সাংবাদিক সমাজ বর্জন করল আমসু–কে।

বড়োভূমি এবং বড়ো জনজাতির ইতিহাস

১৮২৬ সালে প্রথম বার্মিজ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আসাম প্রথম ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৩২ সালে কাছাড়কে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ সালে জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকার মধ্যে ঢোকানো হয় এবং ১৮৩৯ সালে আসামকে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে একটা পৃথক চিফ কমিশনারের অধীনে শাসন চালানো শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে, আসামকে বাংলার পূর্বাংশের জেলাগুলোর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একজন লেফটেনান্ট গভর্নরের প্রশাসনভুক্ত করা হয়। ১৯১২ সাল থেকে আবার আসামকে আলাদা চিফ কমিশনারের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং ১৯২১ সালে পাকাপাকিভাবে এখানে আলাদা প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ভারত ভাগ হওয়ার সময়ে, সিলেটের মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলোর অধিকাংশ পূর্ববাংলার (পাকিস্তান) মধ্যে চলে যায়। ১৯৫১ সালে উত্তর কামরূপের দেওয়ানগুড়ি ভুটানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রশাসনভুক্ত নাগা পাহাড়, জেলা নাগাল্যান্ডের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় ১৯৬২ সালে। আসামের মধ্যেই গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জেলাগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মেঘালয় নামক স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের উদ্ভব ১৯৭০ সালের ২ এপ্রিল এবং ১৯৭২ সালে মেঘালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ওই একই সময়ে মিজো পাহাড়ের জেলাগুলোকে নিয়ে মিজোরাম নামক আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও ঘোষিত হয়। সেই মিজোরামও এখন একটা আলাদা রাজ্য।

সূত্র : দি স্টেটসম্যান ইয়ারবুক ২০১২, ব্যারি টারনার সম্পাদিত।

আসাম নামক রাজ্যটির এই আধুনিক নাম 'আসাম' আসলে খুব বেশিদিন আগে হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শান–রা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হানা দিয়ে এই অঞ্চল দখল করে বসে। এরা অহম নামে পরিচিত ছিল এবং এদের থেকেই আসাম নামের সূত্রপাত। অহমদের পুরোনো ঐতিহ্য অনুসারে 'অসম' শব্দ থেকে যে আজকের আসামের উৎপত্তি তার অর্থ হল 'অনন্য' বা 'তুলনাহীন'। অহমদের মতে, তাদের এই বিশেষণে ভূষিত করেছিল উপত্যকার স্থানীয় উপজাতিরা। সেটা তারা করেছিল এই কারণে যে অহমরাজ উপত্যকা জয় করার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিদের মনও এমনভাবে জয় করেছিলেন যে তাঁর প্রশাসনের কায়দায় বশীভূত হয়ে উপজাতিরাই তাঁকে 'অতুলনীয়' খেতাব দিয়েছিল। কাকাতি–র (বাণীকান্ত কাকাতির লেখা বই 'দি মাদার গডেস কামাখ্যা' দ্রষ্টব্য) মতে এরকমও হতে পারে যে পুরোনো আচাম শব্দটাকে সংস্কৃত করে পরে এটাকে 'আসাম বা অতুলনীয়' করা হয়েছে। তাই ভাষায় 'আচাম' শব্দের অর্থ 'পরাস্ত হওয়া'। অসমিয় ভাষায়, আ–উপসর্গ যোগে 'আ–সাম'–এর মানে হয় 'অপরাজিত', 'বিজয়ী'। যদি সত্যিই শব্দটার উৎস ওরকম হয়, তাহলে জনসাধারণের দিক থেকে দেখলে তা এই দেশের পক্ষে সুপ্রযুক্ত বটে। যাই হোক, 'ব্রাডেন–পাওয়েল'–এর কাছ থেকে আরেকরকম মতও পাওয়া যায় 'আসাম' নামের উৎস সম্পর্কে —— সেটা হল বড়ো শব্দ 'হা–কম' থেকেই এর উৎপত্তি, যার অর্থ হল নিচু বা সমতল দেশ।

আসামের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসীরা কিরাত ও সিনা নামেই পরিচিত ছিল, অন্যান্য উপজাতিদের বলা হত ম্লেচ্ছ এবং অসুর। মহাভারতে ভগদত্ত–র সৈন্যদলের বর্ণনায় সিনা ও কিরাতদের কথা বলা আছে —— এইসব উপজাতীয়দের সেনাবাহিনী ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত।

পুরাণে কিরাতদের 'অরণ্যচারী', 'বর্বর' ও 'পাহাড়ি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হল এরা সব পূর্বভারতের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। অন্য এক পুরাণে এদের বর্ণনা করা হয়েছে, 'বাংলার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের মেষপালক অধিবাসী' হিসেবে। মহাভারতে দেখানো হয়েছে কিরাতেরা ব্রহ্মপুত্রের আশেপাশে থাকে। এই প্রাচীন কিরাতদের বংশধর হিসেবে যারা এখনও কিরাত নামেই পরিচিত, তারা থাকে সিকিমের পশ্চিমে নেপাল ও ভুটানের মাঝে মোরাং নামক পাহাড়ি অঞ্চলে। বর্তমানে কিরাত বলতে ভারতের সীমান্তের মঙ্গোলীয় ধাঁচের সব অধিবাসীকেই বোঝায়। কালিকাপুরাণে আসামের কিরাতদের বর্ণনায় বলা আছে, এরা মাথা ন্যাড়া করে রাখে এবং এদের গায়ের চামড়া পীতবর্ণের, এরা শক্তিশালী, হিংস্র, অজ্ঞ, এবং মদ ও মাংসে আসক্ত।

আসামের প্রাচীন অধিবাসীরা যে মন–খ্মের গোত্রের ইন্দো–চীন ভাষায় কথা বলত, তার বৈশিষ্ট্য অস্ট্রিক–গোষ্ঠীর ভাষার অন্তর্ভুক্ত। ঠিক কোন সময়ে অস্ট্রিকভাষীদের আসামে অনুপ্রবেশ ঘটল তার সাল

তারিখ জানা না গেলেও তা অবশ্যই খ্রীস্টের জন্মের কয়েকশো বছর আগে এবং নিশ্চিতভাবে পশ্চিমদিক থেকে আর্যদের আক্রমণের অনেক পূর্বে। অসমিয় জনগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও আচার–আচরণের মধ্যে অস্ট্রিকভাষী মঙ্গোলীয়দের সংস্কৃতির বহু উপাদান আজও টিকে আছে।

ইন্দো–চীন হামলার দ্বিতীয় ধাক্কার প্রমাণ রয়েছে তিব্বতী–বর্মী ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে। এই ভাষাভাষীদের আদি বাস ছিল পশ্চিম চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াং হো নদীর কাছাকাছি। সেখান থেকে তারা ব্রহ্মপুত্র, চিনদুইন ও ইরাওয়াদ্দি নদীর অববাহিকা ধরে এগোতে এগোতে ভারতে ও বর্মায় ঢুকে পড়ে। এদের মধ্যে যে দলটা আসামে ঢোকে, তারা ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বাঁক বেয়ে এগিয়ে যায়। এদের মধ্যেই একটা অংশ দক্ষিণদিকে গিয়ে প্রথমে গারো পাহাড় ও পরে টিপ্পেরা পাহাড়ের রাজ্যটিকে দখল করে। অন্যরা মনে হয় কাপিলি উপত্যকায় উঠে যায় এবং আরেকটা ভাগ উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু উত্তর কাছাড় ও গারো পাহাড়ের অন্তর্বর্তী যে পাহাড়ি এলাকা খাসি ও জয়ন্তিয়া বলে পরিচিত সেই জায়গাগুলো ওরা দখল করতে পারেনি। মন–খমের ভাষাভাষী মানুষের দেশ হিসেবে এখনও এই অঞ্চল টিকে আছে। তিব্বতী–বর্মী ভাষাভাষীদের আরেক ঝাঁক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাথায় গিয়ে আটকে যায় এবং দক্ষিণদিকের পথ ধরে। ওরা নাগা পাহাড় দখল করে আর এরাই হয়ে ওঠে সেই নাগাদের পূর্বপুরুষ, যারা এমন একগুচ্ছ উপজাতি, যাদের ঠিক নির্দিষ্টভাবে কোনো ভাষাগোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই বহিরাগতদের অন্য এক দঙ্গল প্রথমে চিনডুইন ও ইরাওয়াদ্দি নদীর উজানে বাসা বেঁধেছিল; পরে তারা ক্রমে আসামের দক্ষিণদিকে সরে আসে এবং লুসাই, কাছাড় এবং মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের বেশ কিছু অংশ দখল করে উপনিবেশ গড়ে তোলে। তিব্বতী–বর্মী জাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি অংশের নাম বড়ো। আসামের অনার্য জনগোষ্ঠীর অসংখ্য উল্লেখযোগ্য অংশ গড়ে উঠেছে এই বড়োদের থেকেই। বড়ো গোষ্ঠীর মধ্যে যে উপজাতিগুলো পড়ে তার মধ্যে আছে কোচ, কাছারি, লালুং, ডিমাচা, গারো, রাভা, টিপরা, চুতিয়া ও মারান। বর্তমান কামরূপ জেলার পশ্চিমদিকে যে বড়ো সমাজ রয়েছে, তাদেরকে হিন্দু জনগোষ্ঠী 'মেচ' নামে ডাকে। সম্ভবত এটা সংস্কৃত ম্লেচ্ছ শব্দের বিকৃত রূপ। কামরূপের পশ্চিমের ভিতরদিকে যারা থাকে তাদের কাছারি বলা হয়।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায় যে একসময়ে বড়োরা এই গোটা রাজ্য এবং মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল, বাদ ছিল খালি খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের নামকরণ তারা করেছিল বড়ো ভাষায়। যেহেতু বড়োরা বেশিরভাগই নদীর তীর ঘেঁষে থাকত, তাই পূর্ব আসামের নদীগুলোর নাম মূলত বড়ো ভাষাতেই পাওয়া যায়। বড়ো ভাষায় জলকে বলা হয় 'ডি' (এটা পাহাড়ে এবং পূর্ব আসামে দেখা যায়)। বড়োরা, এমনকী একটা নদীর পুরোনো অস্ট্রিক ভাষার নাম পাল্টে দিয়েছিল তার আগে 'ডি' উপসর্গ জুড়ে — যার অর্থ তাদের ভাষায় জল। যেমন ডি–লং নামের নদীটি। এই নদীর পুরোনো অস্ট্রিক ভাষার 'লং' (জল) নামটার আগে বড়োরা 'ডি' বসিয়ে নতুন নাম দান করেছে।

'বড়ো', ইংরেজিতে Bodo শব্দটার Bod শব্দে বড়ো ভাষায় বোঝায় 'জন্মভূমি'। বড়োরা একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল যাদের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পরিণতি হয়েছে — যেমন চুতিয়া, কাছারি, কোচ ইত্যাদি। এরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু বহিরাক্রমণ এদের সহ্য করতে হয়েছে। এরা পূর্বদিকে বৃহৎ তাই–অহম জাতি এবং পশ্চিমদিকে আর্যবাহিনীর মাঝখানে আটকা পড়ে গিয়েছিল।

ইতিহাসে তাই বা শান (যার অর্থ 'আমাদের দল') জাতির উত্থান দেখা গেছে ইউনান অঞ্চলে এবং সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে বর্মার উত্তরাঞ্চলে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'অহম' নামে এদেরই এক উপজাতি আসাম আক্রমণ করে দখল করে এবং দখলীকৃত জায়গার নাম দেয় আসাম। শান গোষ্ঠীর অন্যান্য উপজাতির মধ্যে যারা 'অহম'–দের অনুসরণ করেছিল তাদের মধ্যে খামতি, ফাকিয়াল, নারাস ও আইতোনিয়ারা আসামের পূর্বাঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। গোটা রাজ্যে, উপত্যকায় এবং পাহাড়ে যারা বসবাস করে তাদের বড়ো অংশটাই বর্তমানে তিব্বতী–বর্মী ও শান জাতির। ইতিহাসের ঠিক কোন পর্যায়ে আর্যভাষীরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হাজির হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু আর্যপ্রভাব এত বিস্তার লাভ করেছিল এবং এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে সাধারণ মানুষের জীবনে এমনকী ছোটোখাটো বৈদিক প্রথাও শিকড় গেঁড়ে রয়েছে।

সূত্র : এ কালচারাল হিস্ট্রি অফ আসাম (আর্লি পিরিয়ড), প্রথম খণ্ড, লেখক বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া, ১৯৬৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ব্রিটিশ শাসনে বড়ো এবং আসামের অন্য জনজাতি (ট্রাইব) অনুভব করে যে ট্রাইবাল বেল্টস অ্যান্ড ব্লক্স–এর জমি ক্রমান্বয়ে ধনী জমিদার এবং নবাগত চাষিদের হাতে চলে যাচ্ছে। ১৯৬০–এর দশকে তারা 'প্লেন্স ট্রাইবাল্স কাউন্সিল অফ আসাম' গঠন করে। ১৯৬৭ সালে তারা আসাম থেকে একাংশ ভেঙে 'উদয়াচল' নামে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল দাবি করে। সেই দাবি পূরণ হয়নি। ১৯৮০–র দশকের শেষের দিকে 'অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' গড়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালের ২ মার্চ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নেতৃত্বে আলাদা স্বাধীন রাজ্য 'বড়োল্যান্ড'–এর দাবি ওঠে। আওয়াজ ওঠে 'ডিভাইড আসাম ফিফটি–ফিফটি'। 'বড়ো পিপ্লস অ্যাকশন কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আসাম সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় এবং 'বড়ো অটোনমাস কাউন্সিল' গঠন করা হয়। চুক্তির বহু ধারা কার্যকর হয়নি। আবার আন্দোলন শুরু হয়। এবারে সশস্ত্র সংগঠন 'বড়ো লিবারেশন টাইগার' (বিএলটি) গড়ে ওঠে। ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার, আসাম সরকার এবং বিএলটি–র মধ্যে চুক্তি হয়। ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে গঠিত হয় স্বশাসিত 'বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল' (বিটিসি) এবং 'বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস'। এই কাউন্সিলের হাতে ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার আসে। বিএলটি–র জায়গায় আসে বড়োদের নতুন রাজনৈতিক দল বিপিএফ (বড়োল্যান্ড পিপল্স ফ্রন্ট)। আর একটি গোষ্ঠী 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বড়োল্যান্ড' (এনডিএফবি) অবশ্য এই চুক্তি মানেনি। তারা আলাদা রাজ্যের দাবি করেছে।

সূত্র : উইকিপিডিয়া।

সমস্ত অনুবাদ করেছেন তমাল ভৌমিক।

বড়ো মুসলমান সংঘর্ষের প্রেক্ষিত

তরেন বড়ো

মুসলমান ও বড়োরা অনেক অনেক বছর ধরে এখানে আছে। আসামে স্বাধীনতার পর খিলঞ্জিয়া (আদি বাসিন্দা) মুসলিমরা এখানে আসে। আমার বাড়ি চিরাংয়ে, অবিভক্ত কোকরাঝাড় জেলায়। আগে ছিল অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা, তারপর হল অবিভক্ত কোকরাঝাড় জেলা, এখন চিরাং। বিটিসি (বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল) চুক্তি হল ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। বিএলটি (বড়ো লিবারেশন টাইগার), ভারত সরকার এবং আসাম সরকারের মধ্যে এই চুক্তি হল। বিএলটি ছিল উগ্রপন্থী সংগঠন। তার আগে ১৯৮৭ সাল থেকে উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মের নেতৃত্বে 'নিখিল বড়ো ছাত্র সংগঠন' (অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা আবসু) গঠন করে দারুণ একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ২৭ মার্চ এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখন ছিল প্রফুল্ল কুমার মহান্তের নেতৃত্বে 'অসম গণ পরিষদ' অগপ সরকার। সেই আঞ্চলিক দলের সরকার একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য ১৯৮৮ সালে 'সেনাবাহিনী বিশেষ সুরক্ষা আইন' (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) লাগু করে দিল। ১৯৮৯ সালে আসামের শাসক চক্র এবং অসমীয় উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় দরং, লখিমপুর ইত্যাদি দুই-তিনটে জেলায় গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ লাগিয়ে দিল। অসমীয়রা হাজার হাজার বড়োদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। যতদূর মনে আছে, স্বাধীনতা দিবসের পর ২৩-২৪ আগস্ট থেকে এই কাণ্ড শুরু হয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ পর্যায় জুড়ে অসমীয় উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং বড়োদের মধ্যে এই জাতিগত হাঙ্গামা চলল।

সেই হাঙ্গামা শান্ত হওয়ার পরে যখন ঘরছাড়া মানুষের পুনর্বাসন হল, ১৯৯১ সালে আবার আন্দোলন শুরু হল। এবার বড়োদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিল। তাদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ শুরু হল। হয়তো অসমীয় উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি বা শাসক চক্রের চক্রান্তও ছিল। এতদিন ছিল একটা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ১৯৯৬ সালের ১৮ জুন বিএলটি-র জন্ম হল। তারা হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে সমান্তরাল সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করল সেনাবাহিনীর দমনের বিরুদ্ধে। সরকারের দমনপীড়ন শুরু হল। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় বহু নিরপরাধ বড়ো সাধারণ মানুষ মরল। কেউ বুঝতে পারল না, কেন এমন ঘটল। কোনো চক্রান্তের ফলে না কী কারণে কেউ আন্দাজ করতে পারল না। একদিকে রঞ্জন দইমারির সশস্ত্র গোষ্ঠী 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বড়োল্যান্ড'[৩], অন্যদিকে হাগ্রামা মহিলারির বিএলটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। কার্গিল যুদ্ধের সময় এক মাস যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছিল হাগ্রামা মহিলারি। তখন দিল্লিতে এনডিএ জোটের সরকার ছিল, তারা এদের ডেকে বলল, এখন তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব বন্ধ করো। কার্গিল যুদ্ধকে মর্যাদা দিয়ে বিএলটি অস্ত্র সংবরণ করল।

এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানির উদ্যোগে ১৮-১৯টা বৈঠক হল বিএলটির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ২০০৩ সালে বড়ো চুক্তি সম্পন্ন হল। প্রকৃতপক্ষে, আন্দোলন করেছিল আবসু। কিন্তু চুক্তি হল সশস্ত্র গোষ্ঠী বিএলটির সঙ্গে। সেইসময় অবশ্য আবসু, বিএলটি বা বড়োদের ১২টা সংগঠনের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা গেল না। সেইসময় অসমীয় উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সকলেই এক ছিল। কারণ ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'প্লেন ট্রাইবাল্স কাউন্সিল'-এর স্বতন্ত্র 'উদয়াচল' রাজ্যের দাবির আন্দোলনে বহু শহিদ হয়েছিল; ১৯৭৪-৭৫ সালের আন্দোলনে ১৮ জন শহিদ হয়েছিল; পরে উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মের নেতৃত্বে 'ডিভাইড আসাম ফিফটি-ফিফটি' আন্দোলনেও শহিদ হয়েছিল বড়োরা। এইসবের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা বড়ো জনগোষ্ঠীর ছিল।

চুক্তির পর একটা দাবি উত্থাপিত হল। যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন না হয়, তাহলে তো আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার 'প্যাকেজ' দেবে না। টানা পাঁচ বছরের জন্য বছরে পাঁচশো কোটি টাকার প্যাকেজ ছিল। পরে অবশ্য তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এই প্যাকেজ নিয়ে হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে বড়োল্যান্ড স্বশাসিত পরিষদ চলল। 'বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্টস' বিটিএডি-র মধ্যে নতুন চারটি জেলা হল : কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও ও পুরোনো কোকরাঝাড়ের অংশ নিয়ে চিরাং, পুরোনো দরং জেলাকে ভেঙে উদালগুড়ি, বরপেটা জেলাকে ভেঙে বাকসা। চিরাং হল আসামের ক্ষুদ্রতম জেলা। তামাম উন্নয়নের কাজ শুরু হল। বড়োল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিকাল এডুকেশনের প্রতিষ্ঠান সব তৈরি হল। কোকরাঝাড়ে সরকারি কলেজ হল। গ্রামে উন্নয়ন বলতে রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি হল।

হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে 'বড়োল্যান্ড পিপল্স ফ্রন্ট' বিপিএফ নামক রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করা হল। ২০০৫ সালের নির্বাচনে হাগ্রামা মহিলারির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর রঘুরাম মার্জারি। দুটো রাজনৈতিক দল হয়ে যাওয়ার ফলে আবার ভ্রাতৃঘাতী নিধন শুরু হল ২০০৫-০৬ সাল থেকে। ২০০৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বিপিএফ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন করে তিনজন মন্ত্রী আর একজন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ পেল। ২০১০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৭৮টি আসন পেল, বিপিএফ পেল ১১টি আসন। পরে বোধ হয় ১৩ জন হয়েছে। হাগ্রামা মহিলারি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট সরকারে অংশ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকাপয়সা ফান্ডিং ইত্যাদি পেয়ে কিছু বিকাশ হয়নি বলা যায় না। কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ আরও বেড়েছে।

এরপর আবসু আলাদা রাজ্যের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করল। তারা বলল, বিটিসি চুক্তিতে যে ধারাগুলি আছে, তাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা নেই, কোকরাঝাড়ে আসাম সরকারের স্পেশাল

---

৩ ১৯৮৬ সালের ৩ অক্টোবর উদালগুড়ির ওদলা খাসিবাড়ি গ্রামে রঞ্জন দইমারির নেতৃত্বে 'বড়ো সিকিউরিটি ফোর্স' গড়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালে নামবদল করে হয় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বড়োল্যান্ড' এনডিএফবি। এদের অধিকাংশই ক্রিশ্চান। ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরে এরা সার্বভৌম বড়োল্যান্ড রাজ্যের দাবি করেছে। এরা দেবনাগরির পরিবর্তে লাতিন অক্ষরে লেখে। সূত্র : উইকিপিডিয়া।

একজন ডিআইজি–র অধীনে চারটে জেলায় আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কিছু করার ক্ষমতা বিটিসির নেই। বড়োদের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে তৈরি হল 'অনাবড়ো সুরক্ষা সমিতি'। এটার নেতৃত্বে রয়েছে কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা। হরেশ্বর বর্মণ, ব্রজেন মহান্ত প্রভৃতি পুরোনো বামপন্থী লোক, যারা কোথাও জায়গা পায়নি, আর কোথায় যাবে! এইসব বামপন্থীদের একটাও এমএলএ নেই। নিজেদের ভুলের জন্যই ওদের এই অবস্থা! প্রফুল্ল মহান্তের আঞ্চলিকতাবাদী সরকারকে সমর্থন দিয়ে সিপিআইয়ের প্রমোদ গগৈ মন্ত্রী হলেন। যে রঙ্গিয়া ঘাঁটি ছিল সিপিএমের, সেখানে কী করে কংগ্রেস এসে গেল? এটা ভাববার বিষয়। আসামে গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল হয়েছে।

বিটিসির মধ্যে রয়েছে মোট ৩০৮২টা গ্রাম। এরা বলল, যেসব গ্রামে ৫০ শতাংশের কম বড়ো মানুষ রয়েছে, সেই গ্রাম বিটিসির মধ্যে থাকবে না। ২০০৮ সালে 'অল বড়ো মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' এবিএমসিইউ তৈরি হয়েছে। আগে ছিল 'অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' আমসু। আমার মনে হয় বিটিসি প্রশাসনই এই এবিএমসিইউ–কে সৃষ্টি করেছে। এই এবিএমসিইউ শেষে 'অনাবড়ো সুরক্ষা সমিতি'–র সঙ্গে মিলে 'বিটিসি বাতিল করো' দাবি তুলল, 'হাগ্রামা মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিল। ২০০৮ সালেই উদালগুড়ি জেলায় নতুন করে মুসলমান ও বড়োদের মধ্যে সংঘর্ষ হল। ২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এই ধরনের কোনো সংঘর্ষ ছিল না। বিপিএফ এবং হাগ্রামা মহিলারির সঙ্গে মুসলমান নেতা আছে, যেমন খলিলুর রহমান, মোক্তার আহমেদ, জাহানারা বেগম প্রভৃতি। এরা এক সঙ্গে কাজ করেছে। কোকরাঝার, চিরাং জেলায় ভিলেজ ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলে (ভিসিডিসি) অনেক মুসলমান নেতা রয়েছে। তাহলে সংঘর্ষ কেন হল?

২০০৮ সালে ঈদের সময় উদালগুড়ি জেলায় সংঘর্ষে বহু মুসলমান ভাই এবং বড়োদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তখন যারা গৃহহীন হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন হয়নি। যে কেউ আই নদীর পারে গিয়ে শিবির দেখে আসতে পারে। চিরাং এবং উদালগুড়ি জেলায় এখনও বেশ কয়েকটা শিবির রয়েছে। এটা কম দুঃখজনক ব্যাপার নয়। সেই ঘটনার ক্ষত মুছতে না মুছতে আবার হল এই ২০১২–তে!

এটা কি তবে অসমিয় জাতীয়তাবাদী শিবিরের কোনো প্ররোচনা? নাগরিকপঞ্জি (ন্যাশনাল রেজিস্টার্ড সিটিজেন) নবীকরণের ব্যাপারটা দেখা যাক। আইএমডিটি আইন (Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act) বাতিল হল। আসু (অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) বলেছিল, আইএমডিটি আইনের জন্য আমরা বিদেশিদের বিতাড়ন করতে পারিনি। ওরা বলেছিল, এটা একটা ভুতুড়ে আইন। এই আইন বাতিল করার পরে আসাম সরকারের কী দায়িত্ব ছিল? বেআইনি অনুপ্রবেশকারী মানে তো কেবল মুসলমান নয়। মেঘালয়, ত্রিপুরায় গেলে দেখা যাবে, কেবল মুসলমানরাই বাংলাদেশ থেকে আসে না। নেপালি, হাজং, হিন্দু বাঙালিরাও বাইরে থেকে আসে। হাগ্রামা মহিলারি সমস্ত জাতিকে নিয়ে একটা মডেল বিটিসি গঠন করতে চেয়েছিলেন। এটা কারা সহ্য করতে পারেনি? আমি সিআইএ বা আমেরিকা ইত্যাদির চক্রান্তের কথা বলি না। শুধু মৌলবাদী বদনাম দেওয়ার জন্য কিছু কায়েমি স্বার্থ এই ষড়যন্ত্র করেছে।

২০১২–র ঘটনা কীভাবে শুরু হল? জুন মাসে এবিএমসিইউ 'অনাবড়ো সুরক্ষা সমিতি'–র সাহায্য নিয়ে গুয়াহাটিতে বিশাল জনসমাবেশ করল। হাগ্রামা মহিলারি, বিটিসি ও বড়োল্যান্ড বিরোধী ছিল এই সমাবেশ। এরপর ঘটল ৬ জুলাইয়ের ঘটনা। এবিআমসুর দুইজন কর্মীকে গুলি করা হল। কোনোরকম তদন্ত না করে কীভাবে ধরে নেওয়া হল যে বড়োরা ওদের মেরেছে? আসাম সরকারের পুলিশও একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বাহিনী। ৭ তারিখ হাগ্রামা মহিলারি ওই দুই কর্মীর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিলেন। ৮ তারিখ শান্তি সভা হল। ফের এবিএমসিইউ ১২ তারিখে কোকরাঝাড় জেলায় বন্‌ধ ডাকল। ১৬ তারিখে মাগুরমারিতে এবিএমসিইউ দুজন আহত হলেন। তার জের ধরে ঘটল ১৯ তারিখের ঘটনা। পুলিশ প্রশাসন ঠিক থাকলে ঘটনা এভাবে এগোত না। ১৯ তারিখ ৪ জন বড়ো যুবককে পুলিশের সামনেই মারা হল। এটাই ছিল মূল প্রতিক্রিয়ার উৎস।

২০ জুলাই কোকরাঝাড়ে মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোল। প্রশাসন একে নিয়ন্ত্রণ করল না। ২১ তারিখে জয়পুর থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হল। ২২ তারিখ দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ঘটনা কোকরাঝাড় জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর তা চিরাংয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কেন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা কমিশনার, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী কেউই একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না? কোথায় গেল প্যারা মিলিটারি? এটাই আমার প্রশ্ন।

একটা আতঙ্ক। মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়নি। হিংসা, তারপর প্রতিহিংসা। এখানে আসামের যাবতীয় সংবাদপত্র, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকাটা কী? এ ডাকছে এবিএমসিইউর নেতাকে, এ ডাকছে বদরুদ্দিন আজমলকে, এ ডাকছে বড়ো সংগঠনের লোককে, এ ডাকছে অসমিয় বুদ্ধিজীবীকে, আর এক চ্যানেল ডাকছে বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে, কেউ ডাকছে বড়ো বুদ্ধিজীবীকে। সবটাই সংঘর্ষ! এরা বড়োকে দশ দিলে, ওরা দশ দেয় মুসলিমকে! যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা থাকে, তাহলে মিডিয়ার ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল? কোথায় গেল মানবতা? কোথায় গেল সিভিল সোসাইটি? প্রত্যেকে পরস্পরকে দোষারোপ করছে। দোষারোপ করে সমাধান হয় না।

এর মধ্যে আবার চলে এল বজরং দল। আসামে কেউ বজরং দলের অস্তিত্বের কথা শুনেছে? বজরং দলের ডাকা বন্‌ধকে সকলে স্বতস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছে। কেন এবিএমসিইউ পিছিয়ে থাকবে? যেই বজরং দল বন্‌ধ ডাকল, পরদিন পাল্টা বন্‌ধ ডাকল এবিএমসিইউ। বজরং দলের বন্‌ধে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। বন্‌ধের বিষয়টা কী? বদরুদ্দিন আজমলকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এবিএমসিইউ–কে তাহলে বদরুদ্দিনকে রক্ষা করতে হয়! আর অমুক অমুককে গ্রেপ্তার করতে হবে! কিন্তু এরই মধ্যে এবিএমসিইউ একটা ভুল করে ফেলল। তারা হাঙ্গামা চালাল এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেটা সকলকে দেখিয়ে দিল।

আমি মনে করি, আসামের সব জেলায় বাংলাদেশি মুসলমান নেই। নামনি আসামে ধুবড়ি বা কোকরাঝাড় জেলায় বাংলাদেশি মুসলমান থাকতে পারে। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ হল, তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে এদেশে এসেছে।

বহু হিন্দুও এসেছে। হাজং, গারো বা রাভা জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তো বাংলাদেশি আছে। বাঘমারা, দালু, মহেন্দ্রগঞ্জ, ইসলামপুর, কালাইচর, নগরপাড়া, ফুলবাড়ি, ভেদবাড়ি, মানকাচরে যারা আছে, তাদেরও তো বাংলাদেশি বলা যেতে পারত। কিন্তু বিশেষ বিশেষ জায়গায় মুসলমানদের কেন টার্গেট করা হল?

আজকের খবরের কাগজে দেখলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মুসলমানদের সন্তানের সংখ্যা বেশি। রাজ্যের প্রধান হিসেবে তাঁর এটা বলা উচিত নয়। মুসলমানদের আট–দশটা ছেলে–বাচ্চা? আমি তো বড়ো, আমার মা–বাবারও তো আটজন ছেলেমেয়ে। এই সংকট–মুহূর্তে তাঁর এটা বলা সমীচিন নয়। আসলে সরকার নিজের অপদার্থতার কথাটা বলতে পারছে না।

আমি সিভিল সোসাইটির একজন সদস্য, মানবিকতায় বিশ্বাসী। পনেরো বছর আমি বামপন্থী রাজনীতি করেছি, এসএফআই-তে ছিলাম। তারপর আমি বাধ্য হয়ে আঞ্চলিক রাজনীতিতে আসি। আবসু করেছি। আবসু সামান্য হলেও সংকীর্ণতাবাদী, তবে তাদের অনেক ন্যায্য ইস্যু রয়েছে। এখন এসেছে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ। পুনর্বাসনের প্রশ্নে পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না। বলা হচ্ছে, শরণার্থীদের অনেকের মাটির পাট্টা নেই, তারা খাস জমিতে রয়েছে। বড়োদের কেউ কি খাস জমিতে নেই? কত জনজাতির, কত লক্ষ মানুষ খাস জমিতে রয়েছে। তাদেরও তো মেয়াদি (স্থায়ী) পাট্টা নেই। আমি বলব, যাদের ১৯৫২ সালের ভোটার লিস্টে নাম আছে; ১৯৭১ সালকে নাগরিকপঞ্জির জন্য ভিত্তিবর্ষ করা হয়েছে, এর মধ্যে যারা পড়ছে সকলেই নাগরিক। ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তির ১০নং ধারায় ছিল — কিন্তু তা কার্যকর হয়নি — কেবল সংরক্ষিত শ্রেণীর (প্রোটেক্টেড ক্লাস) ভূমির অধিকার থাকবে। সংরক্ষিত শ্রেণী মানে হল যারা ভূমিপুত্র (ইনডিজেনাস), আমরা বলি খিলঞ্জিয়া। এর মধ্যে অসমিয় মানুষ আছে, বড়োরাও আছে। আসামের ভূমিনীতি পশ্চিমবঙ্গের মতো নয়। তার মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর আছে। আসামে ৩২টি ট্রাইবাল বেল্ট অ্যান্ড ব্লক ছিল, সংরক্ষিত এলাকা। এর মধ্যে ইনার লাইন পারমিট[৪] নেই। সেই পারমিট থাকলে অন্য কথা। আমরা মুসলমানকে বাংলাদেশি বলছি, কিন্তু যে রাজস্থান বা অন্য জায়গা থেকে আসছে, তারা তো সংরক্ষিত শ্রেণী নয়। ব্যবসায়ী সমাজ তো সংরক্ষিত শ্রেণী নয়। সরকার এদিকে নজর দেয় না। সরকারের দৃষ্টি কেবল তাদের দিকে, যারা শুধু পেটের জন্য চিন্তা করে, জমিতে হাল দেয়, কোদাল ধরে। তারা এখন ভুগবে। যাদের দু–তিন বিঘা জমি ছিল, সেই পরিবারের যদি পুনর্বাসন না হয়, তাদের কী হবে? তাই এটা নিছক বড়ো–মুসলমান সংঘর্ষ নয়, এটা একটা অন্য ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে সামান্য হলেও নির্বাচনের ফ্যাক্টর রয়েছে। ২০১৪ সালে আসামে নির্বাচন। জমি দখল করে নেওয়ার একটা মতলবও আছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কীভাবে ফিরে আসবে? শান্তি কীভাবে আসবে? উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। যদি হাজার হাজার শরণার্থী নিজেদের ঘরে না ফিরতে পারে, আবার গণ্ডগোল বাধবে। মানুষের মনের ক্ষয় ঘটবে। চিরাং জেলায় আমার গ্রামের বাড়ি। সেখানে প্রথমে ১৬টা ঘর ছিল, এখন ৬০ ঘর হয়েছে। বরপেটা থেকে আমাদের আত্মীয়–বন্ধু ওখানে গেছে। এটা হতেই পারে। এদের যদি বাংলাদেশি বলা হয়, সেটা কেমন? এরা ভূমিপুত্র হতে পারে। জমি নেই, একই পরিবারের এক ভাই নিজের গ্রাম ছেড়ে ওই গ্রামে গেছে, এটাও হতে পারে। চিরাং জেলায় নোয়াপাড়া, নদিয়াপাড়া, হাসলবাড়ি, গরুইমারি, মঙ্গোলিয়ান শিবিরে আমি গিয়েছিলাম। মঙ্গোলিয়ান শিবিরের লোকেরা আমায় বলেছে, আমরা বড়ো আর মুসলমানরা এত বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করি, একসঙ্গে জমিতে যাই, কীভাবে এই গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বটা হল? যখন বাইরে থেকে হামলা করতে এসেছে, স্থানীয় মুসলমানরা বাধা দিয়েছে। সেই স্থানীয় মুসলমানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা মুসলমান হয়ে কেন বাধা দিচ্ছ? তোমার ঘরও জ্বালাব। এটা আমি মঙ্গোলিয়ানের শিবিরে পেয়েছি। কোকরাঝাড় ও ধুবড়ি জেলার গোটা সীমানা অঞ্চলে — গোসাইগাঁওয়ে — অচেনা লোক এসে হামলা চালিয়েছে। তারা কোথা থেকে এল? হাগ্রামা মহিলারি বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদী সংগঠনের লোক এসে হামলা করেছে। এরা কারা? কোন দলের লোক? আমি বলব না যে কোনো মৌলবাদী সংগঠন নেই। আবার এটাও বলব না যে বড়ো উগ্রপন্থী নেই। হাতিয়ারধারী লোক আছে। তারা থাকলে সমাজে শান্তি থাকবে না। বেআইনি অস্ত্রধারী মুসলিমও হতে পারে, কেএলও হতে পারে, বাঙালি লিবারেশন ফোর্স হতে পারে, কোবরা হতে পারে। যদি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় একজন বাঙালিকে কেউ মারে, পাশে রাজবংশী আর বড়োরা বাস করে, তাদের ঘরে লাশটা রাখা হল। পুলিশ কাকে ধরবে? একটা রাইটিং প্যাড ছাপিয়ে নেওয়া তো কোনো ব্যাপার নয়। তাতে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হল, অমুক তারিখের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঠাও, নাহলে তোমার জীবন বিপন্ন। এই জিনিসটা এখন বিটিএডি এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

বড়োরা বিটিসি পেয়েছে বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই আসামে তাদের প্রতি একটা অবহেলার দৃষ্টি রয়েছে। আমার মতে, সামগ্রিক পরিস্থিতিটা খারাপ।

বাকসা জেলায় কিছু জায়গায় বড়ো মেজরিটি নেই, তারা ৩৫%–এর নিচে। এরকম ৯৫টা গ্রাম বিটিসির ভিতর থাকতে চাইছে না। বিটিসি চুক্তির ৪.৬ ধারায় লেখা আছে, বিটিএডি এলাকায় জমি ও সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার। বেল্ট অ্যান্ড ব্লক কাজ করবে না। অ–বড়োরাও জমি নিতে পারে। সরকারি চাকরিতে যে কেউ যেতে পারে। শরণার্থীদের মধ্যে শুধু মুসলমান আর বড়ো নয়, কোচ, রাজবংশী, রাভা, নেপালিও আছে। খুব সামান্য বাঙালিও আছে।

অনুলিখন জিতেন নন্দী।

৪ ইনার লাইন পারমিট হল ভারত সরকারের ইস্যু করা ভ্রমণের এক ছাড়পত্র। চারটি সংরক্ষিত রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বসবাসের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক এই পারমিট। আসামে এই পারমিটের ব্যবস্থা নেই। সূত্র : উইকিপিডিয়া।

খবর দিন **খবর নিন**

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

যোগাযোগ : ২৪১৪৭৭৩০, ২৪৯১৩৬৬৬, ৮০১৩৪৭৩৭৪৭, ওয়েব যোগাযোগ : www.songbadmanthan.com

১৯৯৬ সালের বড়ো আদিবাসী সংঘর্ষের বৃত্তান্ত

জাবরিয়াস খাখা

আমি 'আদিবাসী কোবরা মিলিটারি অফ আসাম'–এর চেয়ারম্যান। বর্তমানে আমরা আসাম সরকারের সঙ্গে অস্ত্র–বিরতিতে আছি। ১৯৯৬ সালের ৭ জুলাই আমাদের এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ মে থেকে নামনি আসামে, বিশেষ করে কোকরাঝাড়, ধুবড়ি ও বঙ্গাইগাঁও জেলায় সমস্ত আদিবাসীদের বড়ো উগ্রপন্থীরা নৃশংসভাবে মারতে শুরু করে। আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ঠিক যেভাবে মুসলমানরা দাঙ্গায় আক্রান্ত হল এখন, ওইভাবেই আমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল। আমরা পুরোপুরি অজ্ঞাতে ছিলাম। সমস্ত আসামের লোকে জানে আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। সবার সঙ্গে মিলেমিশে আমরা বসবাস করতাম। বড়োদের যে ইন্টারনাল পলিসি ছিল, জয়গাঁও থেকে — এটা বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গে — তিনটে মেয়েকে নিয়ে এল। গোসাইগাঁও থেকে দক্ষিণে সত্যপুর ফরেস্টে তাদের মারা হল। শারীরিক শাস্তি দিয়ে ওদের জাতিগত পোশাক পরিয়ে আদিবাসী গ্রামের সামনে বড়োরা রেখে দিল। তারপর আদিবাসীদের ওরা বদনাম দিল, তিনটে বড়ো মেয়েকে আদিবাসীরা মেরেছে। ওটাই সূত্রপাত। তারপর ১৫ মে থেকে আদিবাসী খেদানো শুরু হল।

ওদের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন যেগুলো ছিল — বিএলটি, এনডিএফবি — আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে ছেলেগুলোকে বেছে নিত। আমাদের গ্রাম আক্রমণ করার জন্য অন্য এলাকা থেকে ছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছিল। আমাদের দুই লাখ লোকের ঘরবাড়ি ধনসম্পত্তি জ্বালিয়ে নষ্ট করা হল। কমপক্ষে বিশ হাজার মানুষ নিহত হল। তিনটে জেলায় বিভিন্ন শিবিরে আমরা আশ্রয় নিলাম। বারো বছর সময় লাগল আমাদের পুনর্বাসনের। ১৯৯৬ সালের ৭ জুলাই নিজেদের জাতটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা আদিবাসী কোবরা সংগঠন তৈরি করলাম। তখন থেকে আমরা ২০০১ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলন চালালাম। এর পরে আমরা ভাবলাম, এইভাবে তো কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা একপক্ষীয় অস্ত্র–বিরতি ঘোষণা করলাম আসাম সরকারের সঙ্গে। বিশেষ করে দুটো দাবি আমরা রাখলাম। এক, তিনটে জেলার আদিবাসীদের যথাযথ নিরাপত্তা সহ পুনর্বাসন দিতে হবে; দুই, আমাদের তফশিলি জনজাতির (শিডিউল ট্রাইব বা এসটি) মর্যাদা দিতে হবে। আমাদের যে পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের জন্য খুব সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, পরিবার পিছু মাত্র দশ হাজার টাকা। ওই টাকা পাওয়ার পরে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে যার যার নিজের গ্রামে পুনর্বাসন করিয়েছি। যদিও এখনও বেশ কিছু টাকা সরকার দেয়নি। এসটি–র ব্যাপারে আমরা আসাম সরকারের সঙ্গে এখনও বৈঠক করছি। সমস্ত ভারতবর্ষে আদিবাসীরা এসটি স্ট্যাটাস পেয়েছে, আসামে আমরা পাইনি। আসামে আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, ভিল, খারিয়া, শবর, পান, ভূমিজ, গোন্দ ইত্যাদি মোট ৩৬টি গোষ্ঠী আছে।

সরকার বলছে, আমরা এখানে অনেক সংখ্যায় আছি। তাই ওরা দুই ভাগে আমাদের ভাগ করেছে, চা জনজাতি (টি ট্রাইব) আর প্রাক্তন চা জনজাতি (এক্স টি ট্রাইব)। যারা চা বাগানে কাজ করে, ওদের চা জনজাতি বলে; আর আমরা যারা গ্রামে আছি এখন, তাদের প্রাক্তন চা জনজাতি বলে। চা বাগানে চা জনজাতি ছাড়াও অ–আদিবাসী আছে — যেমন ঘাটোয়া, তাঁতি, কুর্মি, দাস — এদের জনজাতিকরণ তো হবেই না। কিন্তু সমস্ত বাগান থেকে এদেরও দাবি আছে, এদেরও এসটি স্ট্যাটাস দিতে হবে। আমরা বলছি, এ ব্যাপারে আপনাদের আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। আপনারা যাদের এসটি দেওয়া দরকার তাদের এসটি দিন, যাদের এসসি (শিডিউল কাস্ট বা তফশিলি জাতি) দেওয়া দরকার তাদের এসসি দিন, যাদের ওবিসি (আদার ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট) দেওয়া দরকার তাদের ওবিসি দিন। এই ব্যাপারে আসাম সরকার ২০১১ সালে তিন সদস্যের একটা এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করেছে। ওই কমিটিকে প্রত্যেক জাতির এথনোগ্রাফিক রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয়, ওটা তৈরি হয়ে গেছে এবং তা আসাম সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। ভারত সরকারকেও ওই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। গত মাসের ২০ তারিখ আমরা দিল্লিতে গিয়েছিলাম। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আমাদের মিটিং ছিল।

এবছর ২৪ জানুয়ারি গুয়াহাটির সরুসজাই ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে পাঁচটি আদিবাসী সংগঠন — আদিবাসী কোবরা মিলিটারি অফ আসাম, বিরসা কমান্ডো ফোর্স, আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, আদিবাসী পিপ্‌লস আর্মি এবং সাঁওতাল টাইগার ফোর্স — আসাম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে অস্ত্র সংবরণ করে।

বিটিএডি–র মধ্যে চারটে জেলার মধ্যেই আদিবাসীরা আছে। বেশি সংখ্যায় আছে কোকরাঝাড়, চিরাং আর উদালগুড়িতে। আমরা আদিবাসীরা প্রায় ২০%, এছাড়া আছে কোচ, রাজবংশী, রাভা, বিহারি, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান।

আদতে আমার গ্রাম ছিল কচুগাঁও। ১৯৯৬ সালের ঘটনার পর আমরা এদিকে চলে এলাম। আমাদের পরিবার ওখানেই থাকে। আমরা যারা জাতিটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছি, তাদের ওরা সবসময় টার্গেটে রাখে। আমরা শ্রীরামপুরে এসে একটু সেফসাইডে আছি। এখানে বড়োদের কোনো উৎপাত নেই।

আমরা মুসলমানদের ওপর এখনকার হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেছি। এরকম জিনিস যেন কখনও না হয়। আমরা বারেবারে সরকারকে বলছি, শিবিরে যে মুসলমান ভাইয়েরা আছে, সেই শরণার্থীদের রেশনপাতি সমেত সমস্ত সহায়তা যেন দেওয়া হয়। অবিলম্বে আসাম সরকার, ভারত সরকার আর বিটিসি প্রশাসন মিলে যেন এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

তবে যখন বড়োরা মুসলমানদের গ্রাম আক্রমণ করল, আমরা বাধা দিতে পারিনি। কারণ ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ দু–বার বড়ো আর আদিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে। আমাদের কোমর ভেঙে গেছে। আমরা মুসলমানদের পক্ষ নিলে আরও ঝামেলা হত। আমরা ভুক্তভোগী, জাতিগত সংঘর্ষটা কী জিনিস, তা আমরা ভালোভাবেই বুঝি। কোনো জাতিই যাতে আক্রান্ত না হয়, আমরা এটাই কামনা করি।

অনুলিখন জিতেন নন্দী।

বড়ো মুসলমান সংঘর্ষের অবসান কোন পথে

গুয়াহাটি বশিষ্ঠতে শান্তি সাধনা আশ্রমে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক আবদুল মান্নান-এর বক্তৃতার অনুলিখন। অনুলিখন জিতেন নন্দী।

আজকের যুবক-যুবতীরা নিশ্চয় বার্টান্ড রাসেলের নাম শুনেছেন। তিনি ছিলেন এক বড়ো মাপের দার্শনিক, মানবতাবাদী এবং শান্তিকর্মী। ১৯৪২ সালে তিনি একটা ছোটো গল্প লিখেছিলেন। ব্রিটেনের এক ব্যারন — খুব ধনী মানুষ — তাঁর ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো ধনী হবেন। আগে থেকেই তাঁর প্রচুর ধন ছিল। কিন্তু তাঁর আরও দরকার। কী করা যায়? ওঁর তিনজন বন্ধু ছিল। একজন ওই দেশের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক, একজন ওখানকার সবচেয়ে বড়ো সংবাদপত্রের সম্পাদক আর তৃতীয়জন এক অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির প্রধান। চারজনে মিলে দিনের পর দিন আলোচনা করছিলেন কীভাবে বেশি বেশি ধন লাভ করা যায়। বহু আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক একটা মডেল হাজির করলেন। প্রচুর ধন লাভ হবে আমাদের, কিন্তু আজ থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। প্রথমে সংবাদপত্রের সম্পাদককে তাঁর কাগজের ভিতর একটা সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। কী সেই সংবাদ? মঙ্গলগ্রহ থেকে লন্ডনের মাটিতে একটা জীব এসেছে, সেই জীব লন্ডনের সমস্ত মানুষকে শেষ করে দেবে। এরপর সেই জীব পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই খতম করবে। এর ফলে মানব সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে। এই খবরটা প্রথমে খুব ছোটো করে ভিতরের পাতায় থাকবে। তারপর অন্য পাতায় ছোটো করে থাকবে। আস্তে আস্তে এই খবরটা ব্যানার হেডলাইন হয়ে উঠবে। এইভাবে ওঁদের কাজ শুরু হল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইংল্যান্ডের সমাজে হই চই পড়ে গেল। একটা দুষমণ এসেছে আর সরকার তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছুই করছে না। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করল। সমাজ জুড়ে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হল। এর মধ্যে ওই সংবাদপত্রে আর একটা খবর বেরোল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একটা দূরবীন বানিয়েছেন, সেই জীব যদি সামনে থাকে তাহলে ওই দূরবীন দিয়ে তাকে দেখা যাবে এবং শীঘ্রই এই দূরবীন বাজারে ছাড়া হবে। দূরবীনটা কীরকম? একটা টিনের সিলিন্ডার, তার দুদিকে দুটো কাঁচ লাগানো, আর কিছু নেই। সেই সস্তার জিনিসটা কয়েক পাউন্ড দামে বিক্রি হতে লাগল। এই মেশিনটা লক্ষ লক্ষ বিক্রি হতে থাকল। ইংল্যান্ডের কোনো মানুষই বলল না যে ওই জীবটাকে সে দেখেনি। যদি কেউ বলত যে জীবটাকে সে দেখেনি, লোকে তাকে প্রহার করত। এইভাবে ওই ধনী ব্যক্তির হাতে কোটি কোটি পাউন্ড জমা হয়ে গেল। সেই ব্যারন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো ধনী মানুষ হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন বড়ো শিল্পী। এই সময় ব্যারন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি এমন এক ছবি আঁকো যা দেখে লোকে ঘাবড়ে যাবে। সেই মহিলা ওই দুষ্কর্মের এমন এক ছবি আঁকলেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের কিছু নবীন বিজ্ঞানী দেখলেন, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। এঁদেরই একজন সেই মহিলার কাছে গিয়ে বললেন, আপনি তো ওই জীবটাকে দেখেননি। কিন্তু এমন এক ছবি এঁকেছেন যা দেখে লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। এটা অন্যায়। আপনি একটা পাপ করেছেন এবং এর জন্য একদিন আপনাকে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেই মহিলা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং স্থির করলেন যে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। গল্পের শেষে রাসেল দেখিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত পুরো বিষয়টা লন্ডন তথা সারা বিশ্বে মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়।

আমি আজ একথা বলতে পারি না যে, আসামে বিদেশি বা বাংলাদেশি নেই। কারণ আজকের আধুনিক যুগে অভিবাসন রয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। মানুষ আসতে পারে এবং আসে। আমি জানি না যে তারা কত সংখ্যায় আসছে। কত শত, কত হাজার, কত লক্ষ বা কোটি আমার জানা নেই। আসামে তো এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, আমাদের এক প্রাক্তন রাজ্যপাল এস কে সিন্‌হা দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে প্রতিদিন ছয় হাজার মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আসামে ঢুকছে। সংখ্যাটা ভেবে দেখুন! দিনে ছয় হাজার মানে মাসে এক লক্ষ আশি হাজার, বছরে প্রায় কুড়ি লক্ষ, পাঁচ বছরে এক কোটি! তাহলে ওই রাজ্যপালের মেয়াদকালে আসামে এক কোটি বাংলাদেশি প্রবেশ করেছে। তারপর তিনি কাশ্মীরে রাজ্যপাল হয়ে গেলেন। এলেন অজয় সিংহ। তারপর আরও দুজন। তাহলে আরও আট-নয় বছরে আরও দু-কোটি। তিন কোটি বহিরাগত যদি এসে থাকে, আসামের মোট জনসংখ্যাই তিন কোটি, তাহলে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা কেউ নেই! এইভাবে তথ্যবিকৃতি ঘটে এবং মানুষকে প্রতারিত করা হয়।

আমি মনে করি, প্রশ্নটা রাজনৈতিক এবং তার রাজনৈতিক সমাধান দরকার। আমি মনে করি আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেই গান্ধীবাদীদের সমাজে একটা সম্মানজনক অবস্থান রয়েছে। মানুষ আপনাদের মত জানতে চায়। এর একটাই সমাধান, প্রথমে আমাদের হিসেব করা দরকার কতজন বাংলাদেশি আমাদের সমাজে রয়েছে। এটা বার করা খুব সহজ। কীভাবে? রাজনৈতিক নেতারা বলছেন, আদবানির মতো অতি সম্মানীয় রাজনৈতিক নেতা বলছেন, এটা দুই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ নয়, এটা অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও বড়োদের মধ্যে সংঘর্ষ। আমি আপনাদের মাধ্যমে ওঁর কাছে প্রশ্ন করতে চাই, আদবানিজী তো ছয় বছর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন একসময়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কতজন বাংলাদেশিকে তিনি শনাক্ত এবং বহিষ্কার করতে পেরেছিলেন? এখানে ওখানে অনেকেই বলছেন, আমাদের ভোটার লিস্টে বাংলাদেশির নাম ভর্তি। তাহলে মানুষকে জানান, কোন কোন নির্বাচনকেন্দ্রে তারা বেশি সংখ্যায় রয়েছে। ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনি করে সেইসব লোকের পরিচয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখলেই পাওয়া যাবে কতজন বাংলাদেশি রয়েছে। যদি কেউ বাংলাদেশি হয়, সে প্রমাণ দেখাতে পারবে না যে ১৯৭১ সালের আগে সে বা তার ভাই কিংবা বাবা এখানে ছিল। অতএব হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারকের তত্ত্বাবধানে একটা নির্ভরযোগ্য সিভিল সোসাইটি গ্রুপকে দিয়ে সমস্ত রেকর্ড পরীক্ষা করা দরকার। সমস্ত জাতীয় স্তরের সংগঠন ও দলের সামনে সেই রিপোর্ট রাখা যেতে পারে। সকলের সহমতে জানা যাবে, কত শতাংশ বাংলাদেশি এখানে রয়েছে। সংখ্যালঘু বা মুসলমান কেউই সেই তথ্যকে অস্বীকার করতে

পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে তখন স্থির করতে হবে কীভাবে সেই চিহ্নিত মানুষদের ব্যবস্থাপনা হবে।

কিন্তু কেউই এই কাজটা করতে চায় না। কারণ প্রত্যেকেই জানে প্রত্যেকে রাজনীতিতে আগ্রহী! ১৯৭৮–৭৯ সালে শ্লোগানটা কী ছিল? 'বহিরাগত'। প্রেমকান্ত মহান্ত অসমিয় ভাষায় একটা বই লিখেছিলেন। এতে তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন, কখন কীভাবে এবং কেন 'বহিরাগত' থেকে 'বিদেশি' এবং তারপর 'বাংলাদেশি' কথাটা এল। আজ তিনি বেঁচে নেই। এই বই পড়লে আসাম আন্দোলনের পশ্চাদপট পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ওই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। আজ তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলন চলবে —— এই রূপে অথবা অন্য রূপে —— কারণ বিষয়টা রাজনৈতিক।

১৯৭৮ সালে আসাম বিধানসভার একটা নির্বাচন হয়েছিল। কংগ্রেস সেই প্রথম আসামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাল। দুলাল বরবরার নেতৃত্বে জনতা দল ক্ষমতায় এল। সেই সময় নাজিরায় একটা সভা হয়েছিল। রাজ্যে ক্ষমতা হারালেও আমাদের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এমএলএ হয়েছিলেন। নাজিরার মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য একটা সভার আয়োজন করেছিল। তিনি ওই সভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমরা হেরে গেছি, জনতা ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু আপনারা ঘাবড়াবেন না, এটা একটা 'হাওয়া'। হাওয়া এসেছে, আবার তা চলেও যাবে।

কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত, সেই নির্বাচনে ২৫ জন বামপন্থী এমএলএ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে সিপিএমের ছিল ১১ জন। যখন আন্দোলন শুরু হল, প্রথমে তার টার্গেট ছিল 'বহিরাগত', তারপর 'বিদেশি' এবং পরে 'বাংলাদেশি'। কিন্তু কেন ১৯৭৯–৮০ সালে প্রায় পঞ্চাশজন বামপন্থী ছাত্র খুন হল? তার মধ্যে আমার নিজের ৩–৪ জন ছাত্রও ছিল। এক কৃষক নেতাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এঁরা কি বহিরাগত, বিদেশি বা বাংলাদেশি ছিলেন? এঁরা তো ভূমিপুত্রই ছিলেন। নগাঁওয়ের কৃষক নেতা বীরেশ্বর ভুঁইয়া এই মাটিরই সন্তান ছিলেন। এগুলো পুলিশ রেকর্ডে রয়েছে। তাই সমস্ত সমস্যাটা রাজনৈতিক, বিষয়টাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। যদি কোনো রাজনৈতিক দল এর সমাধান চায়, তাহলে তারা তা করতে পারে। কিন্তু আমার ভয় হয়, কোনো রাজনৈতিক দলই এর সমাধান চায় না।

আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আসুন আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধকে দু–মাসের জন্য মুলতুবি রাখি এবং দু–মাস যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করি। আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে দোষারোপ বন্ধ রেখে চুপ থাকি যাতে পরিস্থিতি শান্ত হতে পারে। একথা কেউই মানবে না।

তাই সিভিল সোসাইটির এটা দায়িত্ব, গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন যদি এই দায়িত্ব নেয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। আসল শক্তি তো জনগণেরই। আমি দু–তিনটে কথা আপনাদের বলব। দয়া করে সরকারকে বোঝান, বেআইনি সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হোক। এতে ৭০–৮০ ভাগ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

বড়োল্যান্ডে এখন পরিস্থিতিটা কী? আমি যে নগাঁও জেলায় বাস করি, সেই নগাঁও সদর থেকে ৩৫–৪০ কিমি দূরে প্রায় ১২০ ঘর বড়ো পরিবার রয়েছে, তার চারপাশে রয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলমান বাসিন্দা। এই বড়ো পরিবারগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে ওই মুসলমান পরিবারগুলি। এই ছোট্ট গ্রামটার নাম দবগাঁ।

আর একটা ঘটনা বলি। চিরাং জেলায় বিজনি শহর থেকে ২৭ কিমি দূরে আমাগুড়ি উচ্চ–মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শরণার্থী শিবিরে সাত–আট হাজার মুসলমান আশ্রয় নিয়েছে। ওই শিবিরে সরকারি ত্রাণের চাল–ডাল ছাড়া বেসরকারি কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি। কারণ ওখানে যেতে গেলে ২৭ কিমি পথ বড়ো এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পাঁচ–ছদিন পর বরপেটা জেলার একটা ত্রাণ–দল কিছু ত্রাণ সংগ্রহ করে ১৬টা মিনি ট্রাকে ভর্তি করে যাত্রা শুরু করে। চিরাং জেলার প্রশাসন এদের ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ওই দলের মধ্যে আমার দুজন ছাত্রও ছিল। ওরাই আমাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানায়। নয়–দশ কিমি যাওয়ার পর ওরা দেখে একটা সেতু এমনভাবে ভেঙে রয়েছে যে ওর ওপর দিয়ে ট্রাক যেতে পারবে না। ওই সেতুর পাশেই একটা বড়ো গ্রাম। কিছু করার নেই, ফেরত আসতে হবে। এমন সময় কিছু বড়ো যুবক ওখানে হাজির হল। তাদের মধ্যে দু–তিনজন ত্রাণ–দলকে বলল, তোমরা অপেক্ষা করো, দেখি আমরা সেতুটা মেরামত করতে পারি কিনা। এই যুবকেরা নিজেদের ঘর থেকে কাঁধে চাপিয়ে ভারী ভারী কাঠের পাটাতন নিয়ে এল। সেতুটা নিজেদের হাতে মেরামত করল ওরা। তারপর ওই সেতুর ওপর দিয়ে নিরাপদে ট্রাকগুলো যেতে পারল। ওই যুবকেরা জানত, ত্রাণ–দলটা মুসলমানদের এবং তারা এক মুসলমান শিবিরে যাচ্ছে। তারা এটাও জানত, বড়ো বন্দুকধারীরা জানলে কী দশা হতে পারে তাদের।

এটাই প্রকৃত সত্য। কারণ বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ সংঘর্ষ চায় না। সে বড়ো বা মুসলমান যে–ই হোক। কিছু মানুষ তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন

ডাকযোগে সারা বছরের ছয়টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬

আত্মঘাতী সংঘর্ষ : সমাধান কোন পথে

'সংগ্রামী শ্রমিক কেন্দ্র'–এর পক্ষ থেকে ৮ আগস্ট একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন তাপস দাস, রহমত আলী, দিলীপ শইকিয়া, জয়ন্ত দইমারি, নিলেশ্বর সৈনারি, কামেশ্বর ব্রহ্ম, নলিন বড়ো, মোশারফ হুসেন এবং মতিয়ুর রহমান। শিরোনামে তাঁরা লেখেন, 'জাতি হিসেবে নিপীড়িত বড়ো জনজাতি এবং ধর্মীয় অর্থনৈতিক দরিদ্র শোষণে নিপীড়িত মুসলমান সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ আত্মঘাতী সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনো কিছু বলা যায় না।' আমরা এই প্রচারপত্রের কিছু অংশ এখানে বাংলায় প্রকাশ করলাম।

বিটিএডি এলাকাতে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে আসবে এমন একটা আশা ছিল। কিন্তু বারেবারে সংঘর্ষ নানা রূপ নিচ্ছে। গত ২০ জুলাই থেকে বিটিএডি এলাকায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা যে দাঙ্গার আগুন, তাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো চিরাচরিতভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে বাহবা নিচ্ছে। স্থায়ী সমাধানের চিন্তা বা চর্চা কেউ করেনি বলছি না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে স্থায়ী সমাধানের চিন্তা–চর্চার রেওয়াজ দুর্লভ। সম্প্রতি সংঘর্ষজর্জর অঞ্চলগুলোতে গোষ্ঠীসংঘর্ষ বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যা ঘটে চলেছে তা এই প্রথম নয়। তাছাড়া জনজাতি বনাম সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বড়ো লিবারেশন টাইগার বিএলটির মধ্যে সাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা বড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বা বিটিসি মঙ্গলগ্রহ থেকে হঠাৎ আসেনি। এর একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ইতিহাস আছে। বিটিসি গঠন হওয়ার দশ বছর আগে ১৯৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বড়ো নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে বড়োল্যান্ড অটোনমাস কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ওই চুক্তিতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উল্লেখ না থাকাতে সমস্যার সমাধানের বিপরীতে বিভিন্ন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ জন্ম নিয়েছিল। ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে বড়ো জনজাতি বনাম সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয়েছিল। দুই পক্ষের বহু লোক নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল অনেকেই। লক্ষাধিক মানুষকে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য এই যে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আসামে আদিবাসীরা জনজাতি হিসেবে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে তাদের জনজাতির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। যাই হোক, ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবনে মিল থাকা দুটো জনগোষ্ঠী পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিল। ২০০৩ সালে বিএলটি নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তির পরে বড়ো–সাঁওতাল যৌথ নৃত্যে ঘোষিত হয়েছিল মিলনের জয়বার্তা। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিটিএডি–তে শান্তি ছিল। কিন্তু ২০০৮ সালে উদালগুড়িতে বড়ো–মুসলমান সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ দেখে পরস্পরের মধ্যে যে বোঝাপড়া ছিল না তা বোঝা গেল। তারপরে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত বিটিএডি এলাকায় কোনোরকমে শান্তি বজায় ছিল। বড়োল্যান্ডের দাবিতে এবং ২০০৩ সালের চুক্তির অমীমাংসিত ৯৫টি গ্রামকে বিটিএডি–র অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল বড়ো নেতৃত্ব। উল্লেখযোগ্য এই যে ২০০৩ সালের চুক্তির ৩(১) দফা মর্মে বিটিসি–র ভিতরে ৩০৮২টা গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল; ৩(২) দফা মর্মে ৯৫টা গ্রাম, পঞ্চাশ শতাংশের ওপরে জনজাতির লোক থাকলে বা অন্য কোনো সমর্থনযোগ্য প্রাসঙ্গিকতা থাকলে, তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ওই গ্রামগুলোর অন্তর্ভুক্তির দাবির বিপরীতে বিটিএডি এলাকাতে অ–বড়োরা বড়োদের সমান অধিকার পায়নি বলে সেসময় অভিযোগ তুলেছিল, কিন্তু তা সংঘর্ষের রূপ নেয়নি।

৬ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত

৬ জুলাই কোকরাঝাড় জেলার হাওরাগুড়ি থানার অন্তর্গত মুসলমানপাড়া গ্রামে কোনো অজ্ঞাত দুষ্কৃতীর গুলিতে নুরুল হক ও মুজিবর রহমান নামে দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হন এবং ওই সম্প্রদায়ের তিনজন আহত হন। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবিএমসিইউ–র নেতৃত্বে ৭ জুলাই তারিখে কোকরাঝাড় শহরে সহস্রাধিক মানুষ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ওইদিন এবিএমসিইউ–র পক্ষ থেকে চার দফা দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করে। দাবিগুলো হল, নিহতদের পরিবার পিছু দশ লক্ষ টাকা, আহতদের পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা, নিহতদের নিকটাত্মীয়কে সরকারি চাকরি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিটিএডি অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান। দাবিগুলো অযৌক্তিক বলে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু ওই প্রতিবাদ কেবল ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি উগ্রতা এবং ওই জেলার এবিএমসিইউ–র প্রচার–সম্পাদক রফিকউল ইসলাম প্রয়োজনে হাতে লাঠি তুলে নেব বলে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা প্রতিশোধের ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছিল। ৬ জুলাইয়ের ঘটনায় বিটিএডি এবং অন্যান্য বড়ো সংগঠনগুলোর ভূমিকা কী ছিল? ৭ জুলাই বিএলটি দলের সভাপতি তথা বিটিএডি প্রধান হাগ্রামা মহিলারি সন্ধ্যা সাতটার সময় কোকরাঝাড়ে বিটিএডি–র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে নিহতদের পরিবার পিছু এক লক্ষ টাকা, আহতদের পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য, দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর সঙ্গে ৭ জুলাইয়ের প্রতিবাদকারীদের মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়া, নিরীহ ব্যক্তিদের মারধোর করা ইত্যাদি ঘটনার জন্যও দুঃখপ্রকাশ করেন। জেলা বিটিএডি–র সাধারণ সম্পাদক রহীন্দ্র ব্রহ্ম ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আটক করে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ ৬ জুলাই ঘটনার সময় বিটিএডি নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চায়নি বলে বলা যেতে পারে। কিন্তু ৭ জুলাই কোকরাঝাড় শহরে বিক্ষোভের কর্মসূচি এবং তার ধারাবাহিকতায় ১৬ জুলাই এবিএমসিইউ নেতৃত্বের রাজভবন অভিযানে যে ধ্বনিগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেই ধ্বনিগুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিহীন ছিল বলে আমরা বলতে বাধ্য। কারণ বিক্ষোভ সমাবেশে ২০০৩ সালের বিটিএডি চুক্তি বাতিল করা, হাগ্রামা মহিলারিকে শাস্তি দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের চুক্তির ৪(৩) দফার (ক) ও (খ) উপধারায় এবং ৪(৮) ধারায় বিটিএডি এলাকায় অ–বড়োদের ভূমিজ সম্পত্তি সুরক্ষার কথা বলা আছে। উক্ত চুক্তির ৪(৬) দফায় ভারতবর্ষের সংবিধানের ৬নং কার্যসূচির দশ দফা কার্যকর করা হবে না বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ

অ-জনজাতিদেরা টাকাপয়সার লেনদেন, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বড়োরা কোনো আইন প্রনয়ণ করতে পারবে না বলে বিটিসি-তে বলা আছে। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বিটিএডি নেতৃত্বকে দেওয়া হয়নি। ওই চুক্তির ৬ দফাতে লেখা আছে, আসাম সরকারের বিটিএডি এলাকায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন আইনজীবীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। কাজেই আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে আসাম সরকারের ওপরে চাপ দেওয়ার পরিবর্তে বিটিএডি বাতিল করার দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা চিন্তা করার দরকার আছে। মোটকথা, বিটিসি গঠনের চুক্তির ভিতরে অ-বড়োদের নিরাপত্তা প্রদান করার যে শর্ত ছিল, তারা যে নিরাপত্তার দাবি করতে পারত, সেটা করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। যাই হোক, ১৬ জুলাইয়ের প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ১৯ জুলাই তারিখে চারজন বড়ো যুবককে হত্যা করার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ প্রতিহিংসার পথে চলে গেল। তার ফলে শুরু হল হত্যা, হিংসা, অবরোধ এবং অসহায় মানুষের বুকভরা হাহাকার। মোট কথা, ৬ জুলাই মুসলমান মানুষের হত্যার প্রতিবাদ, প্রতিবাদের মধ্যে আটকে না থেকে প্রতিহিংসার পথে চলে গেল এবং সৃষ্টি হল আজকের দাবানল।

আসামে বাঙালি মুসলমান আগমন

বরাক উপত্যকা ছাড়া আসাম পুরোপুরি অসমীয় অধ্যুষিত ছিল। বাইরে থেকে মানুষের আসা শুরু হল ১৯১১ থেকে। ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে তৈরি হল। পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙ্গালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান উভয়েই এসেছে। ১৯৩৯ সালে গোপীনাথ বরদলৈ-এর নেতৃত্বে আসাম কংগ্রেস একটা আওয়াজ তোলে, বাইরে থেকে মানুষের আসা বন্ধ করতে হবে। সেটা ছিল অসমীয় দৃষ্টি থেকে যে তারা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিও (সিপিআই) একটা প্রশ্ন তুলেছিল। অসমীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, একটা কাট-অফ ইয়ার স্থির করা দরকার। ১৯৪০ সালে গোপীনাথ বরদলৈ সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় দফায় সঈদ মহম্মদ সাদউল্লার সরকার তৈরি হল। তারা বলল, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পরিশ্রমী, চাষের কাজে লাগে, ওদের আসতে দাও।

১৯১১ থেকে যে বহিরাগতদের আগমন শুরু হয়েছিল, মাঝখানে একটা বিরতির পর আবার ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রচুর মানুষ এসেছে। বাংলাদেশ গঠনের পরে যে মানুষেরা এল, তাদের বড়ো অংশ বাঙালি হিন্দু। আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানও কিছু এসেছে।

বিটিএডি গঠনের পরে বড়োদের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নিজেদের কৃষিকাজ নিজেরা করার পরিবর্তে ভাড়া করা লোকের ওপর এরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মুসলমানরা এসেছে ধুবড়ির ওপারের দক্ষিণাংশের মানকার চর ইত্যাদি এলাকা থেকে। বড়োদের কাছে জমিতে হাজিরা খাটা, ঘর তৈরি করা, গরু চরানোর কাজে এরা যুক্ত হয়েছে। যারা সেনসাসের কাজে যায়, তাদের এরা বলেছে, আমাদের নাম ঢোকাবেন না, আমরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকে না। যখন এবার দাঙ্গা হল, তখন হাজারে হাজারে মানুষ সুখচর, মানকার চর থেকে যারা এসেছিল, আবার নৌকায় করে ফিরে গেছে।

২০০১ সালের পর বিটিএডি এলাকায় মুসলমানদের অনুপ্রবেশ হয়নি। আসামের ব্যাপক নদীভাঙা লোক, তারা যে যেখানে পারে গেছে। জঙ্গলে গেছে, ট্রাইবাল এলাকায় গেছে। আগে বড়ো, রাভা এরা এই ব্যাপারে উদাসীন ছিল। ১৯৮৫ সালের পরে নদীভাঙা লোকজন ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো তাদের মধ্যে কিছু মানুষ ২০-৩০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকেছে। পরে এখানে জমিজায়গা করেছে। নদীভাঙনে জমি নদীর তলায় চলে গেছে। নদীভাঙা মানুষের মধ্যে কোচ, রাজবংশীও আছে। যেমন, গোলকগঞ্জে একটা নদী বিশাল গতি পরিবর্তন করে। বহু মানুষ তার ফলে উচ্ছেদ হয়েছে।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে একটা বড়ো আন্দোলন আসামে হয়েছে। তার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছিল, বাইরে থেকে মানুষ আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে একটা বিশাল গণবিদ্রোহ হয়ে যায়। হাজারে হাজারে মানুষ কার্ফু ভেঙে রাস্তায় নেমেছে। যখন ১৯৮৩ সালে নির্বাচন করা হল, সেই নির্বাচন বয়কট করা হল। সেইসময় গণচিতা জ্বলেছে, একসঙ্গে ৫০-১০০টা শব দাহ করা হয়েছে। সারি সারি অসমীয় যুবকদের চিতা জ্বালানো হয়েছিল। তারপর নেলীর ঘটনা ঘটল। সারি সারি মুসলমান মানুষকে হত্যা করা হল। প্রত্যেক গণবিদ্রোহের পরে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আসে।

বিটিএডি এলাকায় এখন বিটিসি প্রশাসন বলছে, ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট, ১৯৭১ সালের ভোটার লিস্টে যার নাম আছে আর মাটির রেকর্ড। ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত একটা বড়ো অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে ভালোসংখ্যক মুসলমানও আছে। কিন্তু তারা এসেছে ১৯৭১-এর পরে। কাজেই কাট-অফ ইয়ারে অনেকে আটকে যাবে। কিন্তু মাটির পাট্টা দাবি করে বড়োরা নিজেরাই আটকে যাবে। ওদের নিজেদেরই ফরেস্ট ল্যান্ডে কোনো পাট্টা নেই।

তাপস দাস, সংগ্রামী শ্রমিক কেন্দ্র, আসাম

বিজেপির ভূমিকা এবং অন্যান্য কিছু ভুল বোঝা সম্পর্কে

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির শোচনীয় পরাজয়ের পরে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিন্দুত্বের ট্রাম্পকার্ড ব্যবহার করে বাজিমাত করতে চেয়েছিল। দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের সংগঠনের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ ভাঙন, তাতে সংগঠন দিন-কে-দিন দুর্বল হচ্ছিল। তাই বিটিএডি এলাকায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষকে তারা দেশি-বিদেশি আখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিদেশি বলতে যারা বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান, তাদের বিদেশি আখ্যা দিতে চাইছে। গোষ্ঠী সংঘর্ষের একটা পর্যায়ে হাগ্রামা মহিলারি বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে মন্তব্য করেছেন। আসলে সংঘর্ষের একটা পর্যায়ে বিটিএডি সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে বিলাসীপাড়ার আশেপাশে হাজার হাজার মুসলমান মানুষ লাঠি-বল্লম-দা হাতে নিয়ে বড়ো গ্রাম আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এরা সব পুরোনো মানুষ, কেউ বাংলাদেশ থেকে আসেনি। বিটিএডি এলাকায় ব্যাপকভাবে মুসলমান মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বলে একটা প্রচার আছে। বেশি তথ্যে না গিয়ে কোকরাঝাড় জেলার জনসংখ্যার একটা পরিসংখ্যান আমি পেশ করছি। ১৯৯১ সালে অহম জনসংখ্যা ৮,০০,৬৪৯; হিন্দু ৫,৩১,৪৭৮; মুসলমান ১,৫৪,৮০১ । ২০০১ সালে অহম জনসংখ্যা ৯,০৫,৭২৮; হিন্দু ৫,৯৮,১৬৮; মুসলমান ১,৮৪,৪৪০। এই পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, কোকরাঝাড় জেলায় মুসলমান মানুষের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি হয়নি। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জনসংখ্যার ধর্মীয় বিভাজন পাওয়া যায়নি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা হার পাওয়া যায়। অর্থাৎ একমাত্র ধুবড়ি ছাড়া এই চারটি জেলায় জনসংখ্যার শতকরা পরিসংখ্যান বাড়েনি। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী বিকৃত তথ্যের

ওপর ভিত্তি করে উস্কানি দেওয়া, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছেন। এর ফলে বিজেপি দলের ভোটের রাজনীতিতে কিছু লাভ থাকতে পারে। কিন্তু জনজাতিদের কোনো স্বার্থরক্ষা হবে কি? উল্টোদিকে মুসলমান সম্প্রদায় বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতৃত্ব না-বুঝে উস্কানিমূলক কর্মসূচি নিচ্ছে। এতে কি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থরক্ষা হবে? আসলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তার সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ধ্বংস করার একটা ধারাবাহিক চক্রান্ত চলছে। উদাহরণ হিসেবে পাঞ্জাবিদের জাতীয় সংগ্রামে শিখ এবং হিন্দু বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল; বাঙালি জাতির সংগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে ভাগ করা হয়েছিল। বাঙালি হিন্দুরা ভাবে যে তারাই একমাত্র বাঙালি জাতির প্রতিনিধি। অথচ বাংলাভাষার জন্য বাঙালি হিন্দুরা এক ফোঁটাও রক্ত দেয়নি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) হাজার হাজার মানুষ বাংলাভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছিল। ধর্মীয় বন্ধন তথা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিল। আসামেও অসমিয় জাতির মধ্যে হিন্দু আর মুসলমান বিভাজনের চক্রান্ত বারবার দেখা গেছে। কিন্তু এই চক্রান্ত আজকে আবার ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

কে কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা সংঘর্ষ করছে

একদিকে বড়ো, রাভা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের ভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ১৯৬২-৬৩ সালে বড়ো ভাষার অধিকারের দাবিতে সংগ্রাম, তৎকালীন সরকার যুবক-যুবতীদের গুলি করে হত্যা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। সাময়িকভাবে তা স্তব্ধ হয়েছিল। সেই সময় ধুবড়ি শহরের পোস্টমর্টেম রুমে পড়ে থাকা জনজাতি যুবকদের শবদেহ পচে তার দুর্গন্ধে ধুবড়ি শহরের মানুষ ভীষণ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বড়ো নেতৃত্বের বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্লেন ট্রাইবাল কাউন্সিল কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তীকালে এই দাবিগুলো কেবল ভাষার অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিস্তার লাভ করে এবং ১৯৮৭ সালে পৃথক বড়ো রাজ্যের দাবিতে 'ডিভাইড আসাম ফিফটি ফিফটি' শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বড়োরা। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তখন রক্তাক্ত হয়েছিল এই জনজাতি। তার ধারাবাহিকতায় বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে, কখনো বা সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত, কখনো বা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে গঠিত হয়েছে বিটিএডি। অন্যদিকে আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এই হতদরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়, এই দ্বৈত শোষণে জর্জরিত। একটা কথা স্পষ্ট, আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের মুসলমানদের সম অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সম অধিকার দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তা করেছে বলে ধরে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। জার্মানির ইহুদি হত্যার মতো গুজরাতে মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে। কাজেই বর্তমান সংঘর্ষের একদিকে আছে ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত জনজাতি এবং অন্যদিকে আছে নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। অর্থাৎ গোটা নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে রক্তাক্ত হচ্ছে।

দুটো প্রশ্ন, একটা উত্তর

অনেকেই বলেন, বিটিএডি এলাকায় বড়োরা সংখ্যালঘু। কাজেই বড়ো সংখ্যালঘু মানুষে সংখ্যাগুরু মানুষের ওপর কেন শাসন চালাবে? এ প্রশ্ন উঠবে। অন্যদিকে অনেকেই বলেন, ১৮৮৬ সালের জমি আইন অনুযায়ী ট্রাইবাল ল্যান্ড গঠন করা উচিত এবং ভূমিপুত্রদের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে লোকনাথ বর্ধনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনজাতিদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। পরস্পরবিরোধী দুটো প্রশ্নের একটাই উত্তর। সেটা হল দুটো মুখ একই কথা বলছে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে নিজের মাটিতে অর্থাৎ ট্রাইবাল বেল্টে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া জনজাতিদের জাতীয় অস্তিত্ব কোনোভাবেই লুপ্ত করা উচিত নয়। একই অধিকার রক্ষার স্বার্থে জনজাতিদের বিশেষ অধিকার দিতে হবে। অন্যদিকে বলতে হবে, ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে যেমন বয়স কমানো সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই ইতিহাসের চাকা পিছনদিকে ঘুরিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। আজ থেকে এক-দেড়শো বছর আগে পিছিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

একটা সাবধানবাণী, আয়ার্ল্যান্ডের জনগণ বছরের একটা দিন ঠোঁটের রঙ সবুজ করে। কারণ হল, প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক সংঘর্ষের ফলে আয়ার্ল্যান্ডে এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যে গাছের পাতা খেয়ে তাদের জিভ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কথা মনে করার জন্যই বছরের একটা দিন প্রত্যেক মানুষ তাদের ঠোঁটের রঙ সবুজ করে নেয়। আলোচনাপন্থী এনডিএফবি (প্রো) সচিব সম্পাদক গোবিন্দ বসুমাতারি বলেছেন, বর্তমান সংঘর্ষে তারা নেই। কিন্তু এই সংঘর্ষে তাদের বিজয় হয়েছে। ভবিষ্যৎ-সংঘর্ষ তারাই সৃষ্টি করবে। এছাড়া, নাগরিকপঞ্জি না হওয়া পর্যন্ত বিটিএডি এলাকাতে উচ্ছেদ হওয়া মানুষকে কোনো পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। এইরকম একটা বক্তব্য শান্তি গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক নয় বলেই বলতে হবে। কাজেই এখন তাৎক্ষণিকভাবে নাগরিকপঞ্জি গঠন করা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। নাগরিক পঞ্জি করতে হবে না, এমন কথা নয়। কিন্তু এটা পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা আসলে ঘরছাড়াদের পুনর্বাসন না দেওয়ারই একটা কৌশল। এরই ধারাবাহিকতায় যেন ৫ আগস্ট চিরাং জেলায় এবং ৬ আগস্ট কোকরাঝাড় জেলায় সংগঠিত হত্যাকাণ্ড। এই দুইদিনের ঘটনার উদ্দেশ্য যেন মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা বলেই মনে হচ্ছে। একটা কথা স্পষ্টভাবে যা বোঝা প্রয়োজন সেটা হল, কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বিনিময়ে হতে পারে না। কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে নিজের জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যসূচি আসলে নিজের জাতিকে ধ্বংস করার দিকে পৌঁছায়।

২০০৩ সালে বিটিসি গঠন হওয়ার পরে বিটিএডি এলাকাতে বসবাস করা জনজাতি ও অ-জনজাতিদের কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিকাশ হয়েছিল কি?

বিটিএডি এলাকা গঠন হওয়ার পরে কোকরাঝাড়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকাল কলেজ, সেন্ট্রাল ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজি ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। ওই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ওই আধুনিক শিক্ষার সুযোগ নিতে পেরেছে। চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছরে একশো কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি সামাজিক কাজে অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা ব্যবহার করায় এবং

অন্য কামকাজে জনজাতিরা অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু অ–জনজাতি, নন–ট্রাইব বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো সুযোগসুবিধা পায়নি বলে বলতে পারি না। বিভিন্ন ঠিকা কামকাজে বড়ো যুবকদের সঙ্গে মুসলমান যুবকরা যৌথভাবে কাজ করছে। আসলে প্রতিটি জাতির জাতীয় আন্দোলন ওই জাতির জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাজেই জাতীয় বিকাশের একটা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জাতির আগ বাড়িয়ে থাকা মানুষ সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারে। বিটিএডির ক্ষেত্রে উদীয়মান বড়ো যুবকেরা অনেক বেশি সুবিধা লাভ করেছে। অনেকেই শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলেছে; দু–চারজন বনাঞ্চলে জমি লিজ নিয়ে রাবার বাগিচা, চা বাগিচা গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাবার বাগিচা, চা বাগিচা স্থাপনের জন্য জমির প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে বর্তমান উচ্ছেদ অভিযান চলছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সত্যি কী আশ্চর্য কথা! উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি জায়গায় দেশি–বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিরা ওই অঞ্চলের খনিজ দ্রব্য আহরণ করছে এবং স্থানীয় আদিবাসী ও জনজাতিদের সরকারি আইন ভেঙে উৎখাত করছে। আসামে একটা নিপীড়িত জাতিসত্তার একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অন্য একটি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের মানুষকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। বর্তমান সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এটা প্রধান কোনো বিষয় নয়, কাজেই এ নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চাইছি না।

সমাধানের সন্ধানে

যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন, কার্বি আলং, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা, ডিমাহারগাঁও ইত্যাদি জায়গায় কোথাও বা পৃথক রাজ্য, কোথাও বা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠেছে। কোচ–রাজবংশীরা কামতাপুর রাজ্যের দাবি তুলেছে। অপহরণ ও হত্যা প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। নাগাল্যান্ড, মণিপুরে চল্লিশের দশক থেকে স্থানীয়রা সরকারি বাহিনীর সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষে রক্তাক্ত হচ্ছে। শাসকদলগুলো কখনো কুকি–নাগা, কখনো মণিপুরি–নাগা, কখনো মণিপুরি–বিষ্ণুপ্রিয়া ইত্যাদিদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জাতীয় সংগ্রামগুলো ধ্বংস করতে পারেনি। মেঘালয়ের গারো পাহাড় এবং খাসিয়া–জয়ন্তিয়া পাহাড় নানা কারণে উত্তাল হয়েছে। চল্লিশের দশক থেকে কাশ্মীরি জাতি ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অহম তথা ভারতীয় শাসকেরা কোথাও অটোনমাস কাউন্সিল, কোথাও আলাদা রাজ্য গঠন করে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছে, স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। তাহলে স্থায়ী সমাধানের উপায় কোথায়?

সকল জাতির সমান অধিকারের ভিত্তিতে শান্তি–প্রতিষ্ঠার বিষয়টাকে চিন্তা–চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা খুবই জরুরি।

কোকরাঝাড়ের ডায়েরি

শঙ্কর নন্দী

২ আগস্ট আমরা তিনজন — আমি, সুস্মিতা আর শুভ পৌঁছলাম অশান্ত কোকরাঝাড়। পরদিন থেকে আমরা বেরোলাম তদন্তের কাজে। প্রথমে গেলাম ডেপুটি কমিশনার শ্রী জয়ন্ত নারলিকরের অফিসে। তিনি একই সাথে জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের দায়িত্বে — কোকরাঝাড়ে এভাবেই চলে। আমাদের সঙ্গে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করলেন, পরিস্থিতি বোঝালেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বোঝা গেল। এরপর গেলাম অ্যাডিশনাল ডিসি শ্রী রানিপন মুসাহারির ঘরে। তিনিও আন্তরিক ব্যবহার করলেন এবং বাংলায় কথাবার্তা বললেন। ইনি বড়ো। আমাদের ক্যাম্পের লিস্ট দিলেন এবং বড়ো ও সংখ্যালঘুদের পরিবার পিছু সরকার কীভাবে বস্ত্র বিতরণ করবে তা জানালেন।

এরপর আমরা চললাম একটা বড়ো ক্যাম্পে, যা শহরের কমার্স কলেজে করা হয়েছে। এখানে আমি সাক্ষাৎকার নিই শ্রী সোমেন বসুমাতারি, ৬৭ বছর বয়সি প্রাক্তন পুলিশকর্মীর। ওঁর বাড়ি বড়োমালগাঁও গ্রামে। হামলায় ঘরবাড়ি ভেঙেছে, লুঠ হয়েছে, মারধোর হয়েছে, তবে কেউ মরেনি। গ্রাম থেকে মহিলাদের আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আগে বড়োরা গ্রামাঞ্চলে সংখ্যাগুরু ছিল। দীর্ঘকাল আগে আসা 'উজানি' সংখ্যালঘুদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। নতুন করে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীতে তারা এখন সংখ্যালঘু। এদের কারণে পারস্পরিক বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে জানান, 'আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে, কোথায় যাব?'

এরপর আমরা গেলাম ভুতগাঁও হাইস্কুলের সংখ্যালঘু ক্যাম্পে। শহরের শেষ প্রান্তে। এখানে আমি কথা বললাম মহঃ আমজাদ আলির (৪৫) সাথে। এঁর বাড়ি হেকাইপাড়া গ্রামে। তাঁর অভিযোগ সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে বড়ো পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। ডিমুলি গাঁও পুলিশ রিজার্ভে বড়োরা সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ করতে এলে বড়ো–পুলিশে ১৫ মিনিট গোলাগুলির লড়াই হয়। পুলিশের পক্ষে গুলি চালায় ৫ জন সংখ্যালঘু এবং একজন সাঁওতাল পুলিশ। এছাড়া এই ক্যাম্পে আরও কথা বলি ফুলমা বেওয়া (৩০), যাঁর স্বামী এই দাঙ্গায় মারা গেছেন এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে। শুভ তখন অল বড়ো মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ঘরে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সন্ধ্যে লেগে যায় এতেই, ড্রাইভার তাড়া লাগাচ্ছিল।

৩ আগস্ট সকাল সাড়ে ন–টায় বের হয়ে প্রথমে গেলাম রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সিভিল হাসপাতালে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ অধীর কুমার ব্রহ্ম আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। রুগি দেখার মাঝেই আমাদের সাথে কথা বললেন বাংলাতেই। তিনি জানালেন ২৩ জন দাঙ্গায় আক্রান্ত মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে গৌহাটি পাঠাতে হয়েছিল। এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে তিনটি মেডিকাল ক্যাম্প চলছে। ওষুধের জোগান আসছে ন্যাশনাল রুরাল হেল্থ মিশন থেকে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এই হাসপাতাল ৭ জুলাই এবং ২০ জুলাই আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচেছে। আমরা যখন কথা শেষ করে উঠব, একটা ফোন পেয়ে ডা. ব্রহ্ম জানালেন, একটা বুলেটবিদ্ধ মানুষ আসছে গোসাইগাঁও থেকে। হাসপাতাল ছাড়বার সময় একটা সামরিক বাহিনীর অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে দেখলাম, বয়স ২৫-২৬, কোমরে বুলেট লেগেছে। সাথে পরিবারের লোকজন আছে। তাদের থেকে জানতে পারলাম, নাম প্রদীপ

গোস্বামী, বাঙালি, বিয়ে করেছেন রাজবংশী পরিবারে। এবং শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন। কাছেই সংখ্যালঘু গ্রামে, যেখানে সবাই গ্রামছাড়া, সেখানে ঢুকেছিলেন। প্রহরারত বাহিনী তাঁকে দাঁড়াতে বললে, তিনি ভয়ে দৌড় লাগান। তখন বাহিনী গুলি ছুঁড়লে তাঁর কোমরে লাগে। চিকিৎসার জন্য বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে দ্রুত নামিয়ে দিয়ে গেল।

হাসপাতাল ছেড়ে আমরা গোসাইগাঁওতে যেতে চাইলে 'রাত হয়ে যাবে ফিরতে', ড্রাইভারের এই আপত্তিতে আমাদের যাওয়া হল না। ড্রাইভারের আপত্তির কারণ, বড়ো গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে আসতে হবে। বড়ো যুবকরা অস্ত্র নিয়ে থাকে। রাত হলে ভুল করে আক্রমণ করে দিতে পারে। আমরা গেলাম আংটিহারা। আংটিহারার আগে বড়ো জনপদ, সংখ্যালঘু জনপদ, জঙ্গল, শষ্য রোপিত চাষের মাঠ ও থানা পেরিয়ে একটা পোড়া গ্রামের পাশে আমাদের গাড়ি দাঁড় করালাম। পোড়া গ্রামটা জনমানবশূন্য। সংখ্যালঘুদের গ্রাম। আর ঠিক ডানদিকেই অক্ষত বোরো গ্রাম। রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা গ্রামের নাম বলল চরষিঝড়া আর দোতমা থানা জানাল, গ্রামের নাম নয়ারভিটা। যাই হোক, শুভ আর সুস্মিতা গাড়ি থেকে নেমে গ্রামটা ঘুরে, ফোটো তুলে, লুঠ না হওয়া কয়েকটা আরবি বই নিয়ে এল।

এবার গাড়ি চলল আংটিহারার দিকে। ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করালো একটা ভাঙা কাঠের পুলের সামনে। যে পুল হেঁটে পার হওয়া গেলেও গাড়ি পার হবে না। এখান থেকে হেঁটে আংটিহারা দেড়-দু কিলোমিটার। বেলা পড়ে আসছে। হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি কয়েকটা বড়ো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গোসাইগাঁও যাওয়া যাবে? ভয়ের কিছু নাই তো?' তারা বলল, 'না না, কোনো সমস্যা নেই। দোতমা হয়ে ঘুরে যান।' গোসাইগাঁও তো দূরস্থান, আংটিহারাই যাওয়া হল না। অগত্যা এলাম দোতমা থানায়। বড়োবাবু আমাদের সাথে কথা বললেন, নাম প্রদীপ সরকার। অহমিয়া, তবে বাংলা পরিষ্কার। থানা কাছে থাকতেও দাঙ্গা থামানো বা নিরাপত্তা দেওয়া গেল না কেন জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, ১০–১২ জন নিয়ে থানা চলে। এখন বাহিনী এসেছে। 'আমাদের কিছু করার ছিল না'। অজানা মানুষদের নামে বিভিন্ন ধারায় এফআইআর করা হয়েছে। তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে — গাড়ি ছুটল শহরে। গাড়ি থামল শহরের পার্টি অফিস — অর্থাৎ বড়ো পিপ্‌লস ফ্রন্টের অফিসের সামনে। আমাদের কথা বলতে হবে শ্রী দেরাসাত বসুমাতারির সঙ্গে। তিনি বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী সদস্য। অফিসের অনেক কর্মচারী বা কর্মীর মধ্যে একজন বাঙালি কর্মী শ্রী দে আমাদের নিয়ে বসালেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই শ্রী বসুমাতারি এলেন। তাঁর কথায়, বামপন্থীরা ছাড়া কেউই বিটিসি–র বিরোধী নয়। বিটিসি বিল ২০০৩ সালের ১০ মার্চ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে যাবার পর বামপন্থী এবং কিছু মুসলিম সংগঠন বিরোধিতা শুরু করে। অ–বড়ো সুরক্ষা সমিতির ব্যানারে বিরোধিতা শুরু হয়। তাঁর মতে, যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিটিসি সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এই বিরোধিতা দেশদ্রোহিতার সামিল। ২০০৩ সালে বিটিসি-তে মনোনীত পরিষদ গঠিত হয় তারপর এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কাউন্সিল। স্বরাষ্ট্র ও কারিগরি শিক্ষা বাদে প্রায় সব দায়িত্ব বিটিসি-র হাতে। ৪৬ জন সদস্য নিয়ে বিটিসি। বড়োদের জন্য সংরক্ষিত ৩০, সাধারণ ৫, সকলের জন্য খোলা ৫, মনোনীত ৬। বর্তমান কাউন্সিলে আছে কংগ্রেস ৫, বড়ো প্রোগ্রেসিভ পিপ্‌লস ফ্রন্ট ১, ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পিপলস ফ্রন্ট ১ এবং বড়ো পিপলস ফ্রন্ট ২৯। বিটিসিতে ক্ষমতা পেয়ে বিপিএফ উন্নয়নের কাজ শুরু করে এবং উন্নয়নের প্রভাবে মানুষ বিটিসিকে মেনে নেয়। কিন্তু বাম ও সংখ্যালঘুদের দল বিটিসির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। প্রচার করতে থাকে, সংখ্যালঘুদের অঞ্চলে কোনো উন্নয়নের কাজ হয় না। তাদের বিটিসির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। তাদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সংখ্যালঘু মানুষ সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। এবং নিজেরা ঘটনা ঘটিয়ে বড়োদের ওপর দোষ চাপিয়ে বিটিসির বদনাম করার চেষ্টা করতে থাকে। তার পরিণতিতে আজকের এই অবস্থা।

ব্রিটিশ ভারতে মিশনারিদের শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া ও পরে স্বাধীন ভারতে শিক্ষাবিস্তার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বড়ো অঞ্চলেও শিক্ষার বিস্তার ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েও বড়োরা কিছুটা শক্তি বাড়িয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, পরম্পরার ঐতিহ্য থেকে অধিকারবোধ জন্ম নিয়েছে। লড়াইয়ের ময়দানে জন্ম নিয়েছে বিটিসি।

অন্যদিকে ব্রিটিশ ভারতে অন্য অঞ্চল থেকে কিছু বাঙালি মুসলিম বড়ো অঞ্চলে বসবাসের জন্য এসেছিল। তারা তারপর বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকতে শুরু করে। বড়োদের সাথে আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী অধিবাসীর স্বীকৃতি পেয়ে যায়। বড়োরা এদের মেনেও নেয়। এদের উজানি বলা হয়।

ভারতের স্বাধীনতার পরে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে হিন্দু ও মুসলিম মানুষ জীবন ও জীবিকার টানে ভারতে আসে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ব্যতিক্রমী অবস্থা বাদ দিলে, এর হিড়িক যেমন নেই, তেমনি তা থেমেও নেই। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে বড়োদের অঞ্চলে যাওয়া ও বসতি বিস্তার করা মুসলিমরাই এখনকার সমস্যার কারণ, জানালেন কমার্স কলেজের ক্যাম্পে থাকা সোমেন বসুমাতারি। তিনি আরও জানালেন, এদের বলে, ভাটিয়া।

বহিরাগতদের আগমনে আঞ্চলিক জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে আসছে চিরকাল। আমেরিকায় আজ রেড ইন্ডিয়ানরা শুধু দেখবার জন্য আছে। আর্য আগমনে ভারতের আদি অধিবাসীরা জঙ্গলে পালিয়ে আজ সংখ্যালঘু। মাত্র কয়েকশো বছর আগে একটা ধর্ম (শাসকের ধর্ম) বাংলায় ঢুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল বাংলা এবং ভারত। ত্রিপুরা এখন বাঙালি প্রধান এবং শাসন তাদের হাতে। পুরোনো কলকাতায় সম্ভবত বাঙালি সংখ্যালঘু হয়ে গেছে, আসানসোলে বাঙালি ও অবাঙালি সমান প্রায়।

বড়োভূমির জনবিন্যাসে বড়োরাও আজ সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। বড়োরা নিজেদের ভূমির ওপর অধিকার ধরে রাখতে বড়োল্যান্ড আন্দোলনের মাধ্যমে বিটিএডির জন্য বিটিসি গঠনের অধিকার আদায় করে নিয়েছে সংসদে। বিধানসভায় বিল প্রণয়ন ও পাশের মাধ্যমে। এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিটিসি গঠন হয়েছে বলে তারা দাবি করে।

কিন্তু অবড়ো, যাদের সংখ্যা আজ বড়োল্যান্ডে বড়োদের থেকে

বেশি, তারা এই বিটিসির প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে মেনে নিতে পারছে না। সংখ্যাগুরু হয়েও সংখ্যালঘুর আইনি আধিপত্যে থাকতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে বলে তারা মনে করছে।

এখানে কীভাবে শান্তি ফিরবে?

অথবা অবড়োরা যদি বড়োভূমিতে আশ্রয় পেয়ে বেঁচে আছি মনে করে বিটিসিকে মেনে নেয়, তবে শান্তি ফিরতে পারে।

অথবা, বিটিসি যদি কোটামুক্ত হয়ে বড়োল্যান্ডে বসবাসকারী সব মানুষের সার্বজনীন বিটিসি হয়ে উঠতে পারে এবং বড়োরা যদি হৃদয় দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, তবেই শান্তি ফিরতে পারে।

জীবনের প্রয়োজনে, কেউ কাউকে না ঘাঁটিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে শরণার্থীরা ফিরে যাবেন যে যার ঘরে, কারণ, রাষ্ট্রের পক্ষে এই দায় খুব বেশিদিন বহন করা সম্ভব হবে না। আর অন্য গ্রহে মাটি খুঁজে বসবাসের জায়গা জোগাড় করতে না পারলে ভারত/বাংলাদেশ — দুই রাষ্ট্রের হাতে এমন পতিত জমি নেই যে, যেখানে এদের বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

শান্তি অশান্তি গলা ধরাধরি করে এগোবে — স্থায়ী শান্তি বলে কিছু হয় না, তেমনি স্থায়ী অশান্তি নিয়েও মানুষ বাঁচে না। এভাবেই জীবন চলবে।

বড়ো নেত্রীর চোখে বড়ো মুসলমান সংঘর্ষ

কোকরাঝাড়ে বড়ো পিপল্‌স ফ্রন্টের দপ্তরে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিধায়ক প্রমীলা রানি ব্রহ্মের সঙ্গে পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিলেন রামজীবন ভৌমিক ও জিতেন নন্দী। শ্রীমতী ব্রহ্ম ভাঙা বাংলায় কথা বলেছেন এবং কিছু ইংরেজি শব্দও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন, সেগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখা হল।

মন্থন : নমস্কার প্রমীলাদিদি। আপনি কোন অঞ্চলের বিধায়ক?

প্রমীলা রানি : আমি ১৯৯১ সাল থেকে কোকরাঝাড় পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক। আগে মন্ত্রী ছিলাম। কোকরাঝাড়ে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল আর ধুবড়ি থেকে যে অংশটা যুক্ত হয়েছে সেখানকার একটা, মোট চারটি কেন্দ্র।

মন্থন : আমরা গত পরশু কোকরাঝাড়ের তিতাগুড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম ওখানে শরণার্থী শিবির আছে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম কোনো শিবির নেই।

প্রমীলা রানি : না, তিতাগুড়িতে এখন শিবির নেই। ওদের আলাদা আলাদা সেন্টারে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে দুটি, বিডিও অফিসে দুটি, ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসে একটি আর কোকরাঝাড় কালচারাল সেন্টারে তিনটি, চিরাংয়ের নইগাঁওতে একটি ... এগুলি আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের শিবির। এরা কেউ কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা নয়, ধুবড়ি জেলার গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছে। এগুলো সবই বড়োদের শিবির। মুসলমানরা কেউ কোকরাঝাড়ের শিবিরে নেই। গোসাইগাঁওতে কিছু কিছু আছে।

মন্থন : শিবিরে যে বড়োরা আছে, তাদের সকলের কি মাটির পাট্টা আছে?

প্রমীলা রানি : আমাদের সকলের মাটির পাট্টা আছে। সকলেই স্থানীয় লোক। যারা গরিব, তাদের জমিজমা না থাকতে পারে, তবু ভিটামাটি তো আছে। ওদের অসুবিধা নেই। ওরা তো বিদেশি হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বা নেপালে যারা আছে, সেই বড়োরা তো এখানে আসবে না। তবু সংঘর্ষটা যেহেতু কোকরাঝাড় জেলায় হয়েছে, তাই বড়োরা অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে।

মন্থন : বিটিএডিতে কত বড়ো গ্রাম আছে?

প্রমীলা রানি : আমার কাছে এখন রেকর্ড নেই। তবু রেভিনিউ ভিলেজ হিসেবে প্রায় চার হাজার বড়ো গ্রাম আছে। এছাড়াও ক্লাস্টার ভিলেজ আছে।

মন্থন : বিটিসি কি কিছুটা বাড়ানোর কথা হয়েছিল?

প্রমীলা রানি : কয়েকটা গ্রাম আছে, যেগুলো না বিটিসিতে না আসামে, প্রায় নব্বইটা এরকম গ্রাম আছে। কোনো কোনো গ্রাম আপত্তি করেছে। কিন্তু চুক্তিতে বলা আছে, ৫০%-এর বেশি বড়ো থাকলে বিটিসিতে থাকবে, কন্টিনিউইটি মেইন্টেন করা জন্য ৫০% নেই এরকম মাঝখানের গ্রামও বিটিসিতে পড়ে যাবে।

মন্থন : জুলাই মাসের সংঘর্ষ কেন হল?

প্রমীলা রানি : আসল কথা হল, বিটিএডি-র মধ্যে যারা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা তাদের অভিযোগ তুলে ধরার জন্য 'অবড়ো সুরক্ষা সমিতি' নামের একটা সংগঠন তৈরি করেছে। সকলকে তো ব্যক্তি হিসেবে সুবিধা দেওয়া অসম্ভব। এর পিছনে ষড়যন্ত্র হয়েছে বাইরে থেকে। বিটিসি যেন অশান্ত হয়ে থাকে, এখানে যেন ডেভলপমেন্ট না হয়, তার জন্য এটা ষড়যন্ত্র করে করা হয়েছে। যারা স্কিম পায়নি, টাকা পায়নি, তারাই ওদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে থেকে যারা এমএলএ পায়নি, টিকিট পায়নি, তারা ওদের সঙ্গে গেছে।

মন্থন : এই বাইরের শক্তি মানে কি ইন্ডিয়ার বাইরের?

প্রমীলা রানি : না, আসামেরই, নেতা সব। চক্রান্ত করে এরকম করেছে। আমি প্রশাসনের কাছ থেকে রেকর্ড পেয়ে একথাটা বলছি। যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলেই 'হাগ্রামা মুর্দাবাদ' এই শ্লোগানটাই ওরা দেয়। হাগ্রামাকে অনেক ডিসটার্ব করা হয়েছে। অথচ সবাইকে নিয়ে ডেভলপমেন্টের কাজ করার জন্য হাগ্রামা তৈরি। এখানে সবার উন্নতি হোক, এটাই উনি চেয়েছেন। তবু ওদের মাঝখান থেকে কয়েকটা লোক বের হয়ে ওখানে যোগদান করেছে। ১৯ জুলাই তারিখে রাতুল হক নামে এক ভদ্রলোককে কোনো দুষ্কৃতিকারী গুলি করেছিল। গোরাং নদীর ব্রিজ পার হয়ে মাগুরমারি গ্রামে এটা হয়েছিল। রাতুল হক আসলে পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি অনেক খারাপ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি ক্রিমিনাল কাজ করে ফেলেছেন। মাঝখানে ওঁর সাসপেনশন হল। ওই সময় একজন নাবালিকাকে তিনি রেপ করে মার্ডার করেন। আগে তো মোবাইল ছিল না। পিসিও থেকে ফোন করে আলফার হয়ে তিনি পয়সা কালেকশন করতেন। তারপর ব্লু ফিল্মও করতেন। এইসব ক্রিমিনাল কাজ করার জন্য কয়েকজন ওঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বোধ হয় ওঁর ওপর গুলি করেছিল। যদি এক্স-বিএলটি থেকে করত, ওঁর বাঁচার সম্ভাবনাই ছিল না।

মন্থন : এক্স-বিএলটি মানে?

প্রমীলা রানি : আমাদের এখানে আন্দোলন করার একটা ছিল

বিএলটি। এই এক্সট্রিমিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ভারত সরকার, আসাম সরকার ২০০৩ সালে বিটিসি চুক্তি করে। তারপর ওরা সবাই আর্মস সারেন্ডার করে ওভারগ্রাউন্ডে এসে গেল। এই ছেলেদের নিয়ে একটা সংগঠন বানিয়েছে ওয়েলফেয়ার অফ এক্স–বিএলটি। এরা বেশিরভাগই ইউথ বিপিএলের মেম্বার হয়। তাও কিছু এখনও এক্স–বিএলটি হিসেবে কাজ করে। এই বিএলটির ওপরে ওরা সমস্ত অভিযোগ দেয়। মুসলিম এলাকায় যে সব ঘটনা হয়েছে সব ওরা বিএলটির ওপর চাপিয়ে দেয়। তারপত ওরা কোকরাঝাড় বন্‌ধ করে। আমাদের এদিকে তো বেশিরভাগ বড়ো মানুষ। তাছাড়া বাঙালি, অ–মুসলিম মানুষ থাকে। অ–মুসলিমরা ওদের বন্‌ধ কল সাপোর্ট করেনি। না করার জন্যই কয়েকটা ইনসিডেন্ট হল এখানে। পুলিশের ওপর হামলা, আমাদের ছেলেদের ওপর হামলা হল। তারপর একটা ফরেস্ট ল্যান্ডের ওপর ওরা একটা ঈদগাহ্‌ বানিয়েছিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওই ঈদগাহ্‌টা এভিকশন করে।

মন্থন : ওটা কি চক্রশীলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, বেদলংমারিতে?

প্রমীলা রানি : হ্যাঁ। এভিকশন করার পর ৬ জুলাই ওরা গণ্ডগোল করল। পুলিশের ওপর আক্রোশ মেটায়। এদিকে অ–মুসলিম যারা, তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, মুসলিমগুলোর এত আস্পর্ধা হয়ে গেছে, এত সাহস ওরা কোথায় পেল, এই ভাবটা জেগে উঠল সবার অন্তরে। 'হাগ্রামা মুর্দাবাদ' এই শ্লোগানটাই থাকে ওদের মুখে। তারপর ১৯ তারিখ রাতুল হককে গুলি করা হল, এরপরেই পরের দিন ভাটিপাড়া গ্রামে একটা বাড়িতে গিয়ে ওরা হামলা করেছিল। ওই হামলার কথা শোনার পর আমাদের চারটে ছেলে গ্রামে গিয়েছিল মোটরবাইকে চেপে। ফেরার পথে জয়পুর নামক এলাকা থেকে সমস্ত মুসলিম বের হয়ে এসে এদের বাধা দিল। এই চারজনকে হত্যা করা হল। সেই পিকচারটা দেখে আমাদের বড়ো ছেলেরা থাকতে পারেনি, তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এর থেকেই কিলিং আফটার কিলিংয়ের সূত্রপাত হল ২০ তারিখ থেকে। ২০ তারিখের পর কয়েকটা গ্রামের গাঁওবুড়াকে নিয়ে মুসলিম ছেলেরা আমাদের বড়ো গ্রামে গিয়ে আলাপ করেছিলেন, পরিস্থিতি এখন ভালো নয়, আমরা এখানেই থাকব, বসবাস করব। আমাদের বড়ো গাঁওবুড়া বললেন, ঠিক আছে, কালকে আমি সকলকে ডেকে পিস মিটিং করব। এই আলাপের মাঝেই একটা মুসলিম চ্যাংড়া দূরে গিয়ে টেলিফোনে কয়েকটা মুসলিম ছেলেকে ডেকে নেয়। তখনই ওরা ওই গ্রামটা অ্যাটাক করে। ওখানে দুজন মহিলা, দুজন বৃদ্ধ এবং একজন পুরুষ মানুষকে হত্যা করা হয়। এখনও বোধ হয় একজন হাসপাতালে আছে। এটাই শুরু। শুরুটা তো বড়োরা করেনি।

বাইরের মিডিয়াতে অনেক কথা বলা হয়েছে, বড়োরা এথনিক ক্লিন্সিং করার চেষ্টা করছে। এটা সত্য নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়কে শান্ত করার জন্য অনেকগুলি সংগঠনকে নিয়ে আমরা একটা 'কো–অর্ডিনেশন কমিটি ফর কমিউনাল হারমনি' তৈরি করেছি। এটা নিয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে যাই।

মন্থন : এর মধ্যে কি স্থানীয় মুসলমানরাও আছে?

প্রমীলা রানি : না, ওদের নেওয়া হয়নি।

মন্থন : ওদের সঙ্গেও তো কথা বলা দরকার?

প্রমীলা রানি : কথা বলা দরকার ঠিকই। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, একটা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিয়েছিল, মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর বড়োরা অন্য জাতিকেও তাড়িয়ে দেবে। অন্য জাতিকে আমরা কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে পারি না, এটা অন্যদের বোঝানোর দরকার আছে। এই চিন্তা থেকেই হাগ্রামা মহিলারি সবাইকে দায়িত্ব দিল এবং আমরা ওই কমিটি তৈরি করেছি। এতে ব্যক্তি নয়, সামাজিক সংগঠনগুলো মেম্বার। এতে ২৭টা সংগঠন যোগ দিয়েছে। তারপর আমরা সবাইকে শান্ত করতে পারলাম। আদিবাসীদের অন্তরে সামান্য সন্দেহ ছিল। কেননা ১৯৯৬ সালে একটা ঘটনা নিয়ে আমাদের বড়োদের সঙ্গে আদিবাসীদের হাঙ্গামা হয়েছিল। তার জন্য আমরা ভিতরে ভিতরে কাজ করছি। যেহেতু উত্তেজনা থামেনি, তাই আমরা মুসলিমদের এর মধ্যে ডাকিনি। পরে আমরা ওদের ডাকব। সরকারকেও আমি বলেছি মিটিংয়ে, এখন যদি ওদের গ্রামে নেওয়া হয়, তাহলে ঠিক হবে না। কারণ এখনও সব শান্ত হয়নি।

মন্থন : বিটিএডির মধ্যে শতাংশ হিসেবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কারা কত আছে?

প্রমীলা রানি : এটা তো ট্রাইবাল বেল্ট অ্যান্ড ব্লক এলাকা নিয়ে বিটিসি গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে আমরা ৫০%–এর ওপরে। ট্রাইবাল (এসটি) হিসেবে বড়ো ছাড়াও রাভা আছে, সনোয়াল কাছারি আছে, আরও কিছু আছে। এর বাইরে রাজবংশী, নাথ গোষ্ঠী, আদিবাসী আছে — আদিবাসীরাও বাইরে থেকে এসেছে ... লোকাল মুসলিমদের পপুলেশন অত বাড়েনি, বেড়েছে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

পাক্ষিক এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হোন।

ডাকযোগে সারা বছরের চব্বিশটি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা।

খবর এবং গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন।

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

শরণার্থী শিবির থেকে বলছি

আসাম সরকার সূত্রে জানা গেছে, নামনি আসামের পাঁচটি জেলায় এখন ২০৬টি শরণার্থী শিবিরে ১,৮৭,০৫২ জন শরণার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ১৭৪টি শিবিরে মোট ১,৬৮,৮৭৫ জন বাঙালি মুসলমান এবং ২৯টি শিবিরে ১৭,৩৪৪ জন বড়ো এবং ৩টি শিবিরে ৮৩৩ জন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। ধুবড়িতে ১২৯টি শিবিরে রয়েছে ১,০১,৩৭৩ জন, কোকরাঝাড়ে ৪৩টি শিবিরে ৫৫,৭৬০ জন, চিরাংয়ে ২২টি শিবিরে ২৩,৬০৯ জন, বঙ্গাইগাঁওয়ে ৯টি শিবিরে ৫৫৫৪ জন এবং বরপেটায় ৩টি শিবিরে ৭৫৬ জন রয়েছে। ১৯ জুলাই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পর সর্বোচ্চ ৩৪০টি শিবিরে মোট ৪,৮৫,৯২১ জন আশ্রয় নিয়েছিল। সূত্র : পিটিআই, ১৬ আগস্ট।

শিবির : গ্রাহামপুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোসাইগাঁও

রেজিয়া বেওয়া : আমি এই শিবিরে আছি। আমার গ্রাম গোসাইগাঁও হাবরুবিল। ২৪ জুলাই আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্বামীকে ১৯৯৮ সালের ২৬ জানুয়ারি বড়ো উগ্রপন্থী রাজা আর মঞ্জু গুলি করে মেরেছিল। তখন আমার ২৫ দিনের একটা ছেলে আর ছয় বছরের আর একটা। সরকার আমাকে চাকরি দিয়েছে। আমি দুটো ছেলে নিয়ে হাবরুবিলে বাড়ি করে ছিলাম। কোনো অসুবিধা ছিল না। ৬ জুলাই গণ্ডগোল লাগল। কাসিয়াবাড়ি সাপকাটার ওদিকে একটা মিস্ত্রি ছেলেকে উগ্রপন্থীরা বন্দুক নিয়ে এসে গুলি করে মারে। সে ওখানে কাজ করতে গিয়েছিল। এরপর ভাদুয়াগুড়িতে একটা দোকানে লোকে বসেছিল, ওখানে বাইকে করে এসে গুলি করে। দুজন নিহত হয়, দুজন আহত হয়। এরপর কোকরাঝাড়ে দুজন আমসু নেতাকে গুলি করে মারে। একজন মহিলাকে যখন চারজন বড়ো জাতির উগ্রপন্থী আক্রমণ করছিল, তখন তাদের মুসলমানরা মেরেছে। এটা মিথ্যা কথা নয়, সত্য কথাই।

এরপর আন্দোলন শুরু হল। আমরা টিভিতে দেখেছি। ভাবি নাই যে এরকম হবে। চারদিন আমি ঘরেই বন্ধ ছিলাম। তারপর আমার প্রতিবেশীরা বলল, এখানে গণ্ডগোল হবে। আপনারা যদি জান বাঁচাতে চান, এখান থেকে চলে যান। এরপর আমরা গেট খুলে দেখলাম, অনেক বড়ো জাতির লোক হাতে হাতে অস্ত্র নিয়ে মজুত। ওরা আমাকে বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি যান, আপনাদের বাঁচাতে পারব না। ইতিমধ্যে দেখি, পিছন থেকে বহু গুলির আওয়াজ, হল্লাচিল্লা। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, আমরা ঘরে ফেঁসে গেছি। আমার ছেলের প্যারালাইসিস বিমারি। আমরা যেতে পারছি না। আপনারা ব্যবস্থা করুন। সময়টা ছিল ২৪ জুলাই বিকেল পাঁচটা। দশজন পুলিশ এসে দুখানা গাড়ি পাঠিয়ে আমাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল। গোসাইগাঁও সার্কিট হাউসে চারদিন ছিলাম। পরে ফোন করে জানতে পারি বাড়ির সব ভেঙে নিয়ে গেছে, ঘরের চালটাও নেই।

দূর থেকে ওরা এল। আমাদের কোনটা মুসলিম ঘর, কোনটা হিন্দু ঘর, কোনটা আদিবাসী ঘর ওরা জানে না। কাছের লোক সাথে থেকে ওদের দেখিয়ে দিয়েছে। এইটা এইটা মুসলিম ঘর, যাতে অন্য ঘরে আগুন না লাগায়। আমাদের বাড়ির সামনে রাজবংশী আছে দুটো ঘর, ওদের পোড়েনি। পিছনে আদিবাসী আছে, ওদের পোড়েনি। খালি আমাদের মুসলিম চারটে ঘর পুড়েছে।

একমাস আগে মিটিং হয়েছে, বড়োল্যান্ড আসাম সরকারের আন্ডারে থাকবে না, ওরা ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকবে। চারদিন দিসপুরে মিটিং করে এটা ওরা দাবি জানিয়েছিল। অন্য অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের তরুণ গগৈ বলেছে, না, বিটিএডি আসাম সরকারের মধ্যে থাকতে হবে। এই নিয়ে মনে হয়, হাগ্রামা একটা গ্রুপ করেছে, আমাদের যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে না দেয়, আমরা এখানে মুসলিমদের থাকতে দেব না। খালি মুসলিম নয়, মুসলিম খেদানোর পরে অন্য অন্য জাতিকেও খেদাব। যেমন, ১৯৯৬-এ আদবাসী মেরেছে, রাজবংশী মেরেছে, তারপর আপার আসামে মুসলিমদের মেরেছে, এবার আমাদের মারল। এভাবে মেরে মেরে সব খেদিয়ে দিয়ে ওদের বিটিএডিতে ওরাই থাকবে।

আমরা চাই যাতে বিটিএডি বাতিল করা হয়। আমাদের জন্মভূমি, আমাদের বলছে বাংলাদেশি। একজন যদি বাংলাদেশি থাকে, তার জন্য আমরা ৯৯ জন কেন ভুক্তভোগী হব? আমার বাবার ১৯৫১ সালের এনআরসি আছে, ১৯৫০ সালের ১০০ বিঘা মাটি আছে। তখন খাস ছিল, নিজে পাট্টা করে নিয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে। আমার চাকরি আছে। তাহলে আমি কী করে বাংলাদেশি হলাম? প্রমীলা রাণী বলেছে, মণিপুরে মণিপুরি আছে, চীনে চীনারা আছে, আমাদের বড়োল্যান্ডে বড়োরাই থাকবে। খেতে রুয়া গাড়তে গেলে গায়ে কাদা লাগে। আমাদের মারতে গিয়ে ওদেরও কিছু পুড়েছে। যেখানে বড়ো সংখ্যায় কম, মুসলিম বেশি, সেখানে তো মুসলিম জ্বালাবেই। ওরা যদি পঞ্চাশ গ্রামে আগুন দেয়, এরা তো দশ গ্রামে দেবেই।

হাগ্রামা বড়োল্যান্ডের সুরক্ষার জন্য ফিক্সড পে দিয়ে বিটিএডি ব্যাটেলিয়ন বানিয়েছে। ওই ব্যাটেলিয়নকে বড়ো চ্যাংড়াদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা আগে আগে এসেছে, গুলি করেছে, পিছনে বড়ো জাতির লোকেরা এসে ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে লুঠপাট করেছে।

অ-বড়োদের মাটি কেনার পারমিশন ওরা চারবছর বন্ধ করে দিয়েছে। বড়োদের অ্যাপ্লিকেশন দেখে ওরা লগে লগে ফাইল পুট-আপ করে দেয়। পঞ্চাশ বিঘা মাটি হলেও ওরা ক্যাশ টাকা দিয়ে রাখে। আর আমাদের মুসলিম বা অন্য অ-বড়ো জাতির ফাইল ওরা ফেলে রাখে। চার-পাঁচ বছর কোনো মুসলিম মাটির নামধারী বা রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না। তাহলে মুসলিমদের মাটির কাগজ কীভাবে থাকবে? একটা আইন করেছে, মুসলিম বড়ো জাতিকে মাটি বেচতে পারবে, বড়ো জাতি মুসলিমকে বেচতে পারবে না। তাহলে এই বিটিএডির ভূমিটা কার কাছে যাবে?

শিবির : ধুতুরামারি মধ্য ইংরাজি মাদ্রাসা, গোসাইগাঁও

সোরাব আলি : আমার বাড়ি গোসাইগাঁওয়ের আন্ঠাইবাড়ি গ্রামে। আমাদের গ্রামটা বড়ো, ৩৬০টা পরিবার। প্রথম রোজার একদিন আগে থেকে গণ্ডগোল শুরু হল। পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে সাফ করে দিয়েছে। আমি বিকলাঙ্গ মানুষ। প্রথমে আমরা আসি গৌরীপুর চৌরঙ্গী মোড় শিবিরে। ওখান থেকে এখানে এসেছি দশ-পনেরো দিন। এখন মণ্ডল এসে বলছে, যার নামধারী মাটি আছে, সে বিটিসির মধ্যে যেতে পারবে, অন্যরা যেতে পারবে না। মাটি তো আমরাও কিনেছি। দশ-পনেরো বছর আগে নামধারী বন্ধ করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি রেজিস্ট্রেশন করা আছে, বাকিটা নেই। সেই মাটি দু-তিন বছর আগে কিনেছি। উপেন্দ্র ব্রহ্ম যখন প্রথম আবসুর আন্দোলন করল, তখনই জমির কেনাবেচা বন্ধ করে

দিয়েছিল। অ-বড়ো যত আছে, আমরা যদি মাটি কিনি, নামধারী হতে পারব না, রেজিস্ট্রেশন হবে না। আমাদের কাঁচা কাগজ আছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, সেগুলো আনতে পারিনি। জান বাঁচাব, না কাগজ নেব? টাকা পর্যন্ত নিতে পারিনি সঙ্গে। এনডিএফবি এসে গুলি শুরু করল। এমএলএ, বিধায়ক সঙ্গে এসেছে, ওরাই বলছে, দে দে গুলি কর। খাদ্যমন্ত্রী, এসপি, ডিসি এসেছিল, আমরা সবাইকে বলেছি। ওরা এসে আমাদের তিনটে শর্ত মেনেছে। সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ফোর্স দেবে, ঘর বানিয়ে দেবে, রিলিফ দেবে। ওরা বলল, আপনারা গ্রামে যান। কিন্তু আমি যখন বললাম, বিটিসি বাতিল করতে হবে; বিএলটির হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। তখন ওরা বলল, এসব লম্বা-চওড়া বাত মাত বোলো। ভোটার লিস্টে আমার নাম আছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের লিস্টে নাম চাইছে।

১৯৭০ থেকে আমরা ওই গ্রামে আছি। আগে ছিলাম ধুবড়ি জেলায়।

শিবির : হাতিধুবা কলেজ, গোসাইগাঁও

মহঃ জয়নাল আবেদিন শেখ, গাঁওবুড়া, অন্ঠাইবাড়ি : গ্রামে আধা মানে ১৪১ ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমার গ্রামে মোটামুটি ৩৫০ ঘর ছিল। বাকি সব লুঠপাট করে শেষ করে দিয়েছে। ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছে, কাঠখড়িগুলো খুলে খুলে নিয়ে গেছে। পৌনে তিনশ মুসলিম ঘর, আর আছে আদিবাসী কোচ রাজবংশী। বড়ো আছে ৩৩ ঘর। শীল আছে এক ঘর। যারা ঘর জ্বালিয়েছে বাইরে থেকে এসেছে, প্রতিবেশীরাও ছিল। তীর এবং বাঁটুল (গুলতি) দিয়ে মারামারি হয়েছে। ২১ জুলাই শুরু হয়েছিল। তিনদিন এরকম হওয়ার পরে আমরা থানাকে জানালাম। একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনিও ওদের বহুৎ বোঝালেন। ওরা সরে গেল। আমরাও সরে এলাম। পরদিন ১৪৪ ধারা দিল। আমাদের আর ঘর থেকে বেরোতে দেয়নি। বিকেলের টাইমে ওরা এগিয়ে এল। অন্ঠাইবাড়ির পুবদিকে একটা ব্রিজ আছে। ওই ব্রিজের ওদিক থেকে ওরা আসছে আমাদের গ্রামে। আমরা এসডিপিওকে ফোন করলাম, ওসি সাহেবকে ফোন করলাম। ওরা কোনো উত্তর দিল না। ফাঁকা ফায়ারিং হয়ে গেল। শুনে আমাদের মন ভেঙে গেল। এদিকে প্রশাসনও আমাদের হেল্প করে না। আমরা তখন কার সহায়তা পাব? আমাদের সঙ্গে অস্ত্রপাতি কোনো কিছুই নেই। বাধ্য হয়ে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিকেল সাড়ে তিনটায় ওখান থেকে রওনা দিয়েছি। এখানে সকলে এসেছে রাত আটটায়। আমি এসে পৌঁছেছি সাড়ে দশটায়।

বিটিসিতে ভিসিডিসি আছে। আমরা ওতে আছি বটে, কিন্তু বড়োরাই ওর হেড। আমরা নামমাত্র আছি, কর্ম যা কিছু ওরাই করে। ১৯৯২ সালে আমাকে গাঁওবুড়া সিলেকশন করা হয়েছে। আমাদের গাঁওবুড়ার সার্টিফিকেট বহু সরকারি ক্ষেত্রে চলে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, রেশন কার্ডে আমার সার্টিফিকেট চলে। ১৯৮৪ সালে ওরা বড়ো বেল্ট অ্যান্ড ব্লক পেল। তখন থেকে আমাদের মাটির রেজিস্ট্রেশন বন্ধ। কাঁচা পাট্টা ইস্যু হয়েছে ১৯৭৬ থেকে। নাহলে নামধারী হতে হবে। আসাম সরকার ওদের সঙ্গে পারছে না, আমরা তো একটা গ্রামের প্রতিনিধি! আমাদের কথা ওরা শুনবে কি?

মহঃ আনোয়ার আলি, গাঁওবুড়া, বাবুবিল, গোসাইগাঁও : আমি এই শিবিরে আছি। আমাদের গ্রামের বহু ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, দোকান জ্বালিয়েছে। গ্রামে আমাদের মুসলিম ঘর ৩১০-৩১৫; আদিবাসী ২৩-২৪ ঘর; রাজবংশী ৪০-৪৫ ঘর; বড়ো ৩ ঘর। বড়োদের সঙ্গে আমাদের মেল-মহব্বত ছিল। আমাকে ওরা মেনে চলত। হঠাৎ করে ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। ২৪ জুলাই আমরা সবাই চলে এসেছি। কিছু ঘর পোড়েনি। তবে জিনিস লুঠপাট সকলের ঘরেই হয়েছে। তিনদিন ধরে তিনবার ওরা আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। তিনদিনই আমরা বাধা দিয়েছিলাম। তারপর কার্ফু হল। ওরা পুলিশ প্রশাসনের পোশাক পরে এসে ফাঁকা ফায়ারিং করেছিল। আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব? পুলিশ না পাবলিক? ভয়ে আমরা চলে এলাম। মোটামুটি ৫০-৬০ ঘরের মাটির পাট্টা নেই। পনেরো বছর থেকে নামধারী করা বন্ধ আছে। রেজিস্ট্রেশন পারমিশন নিয়ে কতকগুলো করেছিল। বিটিসি অফিস থেকে অর্ডার না দিলে নামধারী ওরা দেবে না। আমরা বলছি, পাট্টা যাদের নেই, যাদের পাট্টার মাটি বেশি আছে, সেখানে গিয়ে থাকবে। আমারই ধরা যাক, দশ বিঘা মাটি আছে। সেখানে ৩০ ঘর গিয়ে থাকল।

শিবির : সোনাহাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, ধুবড়ি

মহঃ আবারুদ্দিন শেখ : ২৪ জুলাই মঙ্গলবারের ঘটনা। আমরা কোকরাঝাড় জেলার ভদেয়াগুড়ি ১নং থেকে পালিয়ে এসেছি। বড়োরা আর্মির পোশাক পরে এসেছে। থানার লোক আমাদের রক্ষা না করে ধাওয়া দেয়। তখন আমরা যে যেভাবে পারলাম চলে এলাম। পায়ে হেঁটে, গাড়ি ধরে রাত বারোটা-একটা হয়ে গেছে আসতে। এখানে প্রথমে স্কুল কমিটি জায়গা দিতে রাজি হয়নি। গ্রামের লোক আশ্রয় দিয়েছে। মুসলিম, রাজবংশী আছে এখানে। তারপর সরকার সাহায্য দিয়েছে। এখন শুনছি যে আমাদের তিনদফায় ফেরত নেবে। আমরা যদি যেতে হয় একদফায় যাব। ঘরের কাগজপত্র কিছু পুড়ে গেছে, কিছু লুঠপাট হয়ে গেছে। যারা আগের থেকে সংগ্রহ করেছে, নিয়ে এসেছে। যে যেভাবে পারে বেরিয়ে এসেছে। যারা খাসজমিতে আছে, তাদের কী করবে এখন শোনা যাচ্ছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, বড়োরা সংখ্যায় কম। ওরা ২৫%, অন্যরা ৭৫%। বাংলাদেশির নাম করে আমাদের খেদিয়ে দিয়ে ওরা সংখ্যাটা বাড়িয়ে নিতে চায়।

আবদুল করিম : পয়লা রোজার দিন আমরা কদমগুড়ি (গোসাইগাঁও মহকুমা) থেকে এখানে এসেছি। ওখানে আমাদের বন্দুক দিয়ে মারামারি করে খেদিয়ে দিয়েছে। হাতে বন্দুক, তীর, বাঁটুল নিয়ে এসেছে। আমরা ওদের আটকাতে পারিনি, ভেগে গেলাম একটা কোম্পানির (ফ্যাকট্রির) মধ্যে। ওখানেও বলে, ভাগো। বাধ্য হয়ে বৃষ্টির মধ্যে দুদিন তিনদিন হেঁটে এখানে এসেছি। এখানকার লোক আমাদের জায়গা দিল। আমি সেদিন দেখতে গিয়েছিলাম গ্রামে। খালি ভিটা, সব শেষ। আমাদের সবার মাটির পাট্টা আছে। কিছু আনতে পেরেছে, কিছু পারেনি। আমার মনে হয়, আমরা ফিরে গেলে আবার গণ্ডগোল হবে।

শিবির : হাপাসরা, বঙ্গাইগাঁও

নুর মহম্মদ আলি, ৩নং নাচনগুড়ির পঞ্চায়েত সদস্য, বঙ্গাইগাঁও : ৭ অক্টোবর ১৯৯৩ বড়োল্যান্ড থেকে মুসলমানদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার পর তারা হাপাসরা গ্রামে শিবির বেঁধে আছে। একবছর আগে সরকারের তরফ থেকে পুনর্বাসনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে ৫৫০ ঘর মানুষ। তারা ৩নং নাচনগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় এক পোয়া আধাপোয়া জায়গা কিনে শিবিরের মতো করে আছে। এখনও ৬৮৩ ঘর টাকা পায়নি। পাটাবাড়ি, তুলসিঝোরা, আমডাঙা, আমাগুড়ি, ভাওরাগুড়ি ইত্যাদি গ্রাম থেকে তারা দশ বছর বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়

নিয়ে থাকে। সেখানে থাকতে না দেওয়ায় বঙ্গাইগাঁও জেলায় আসে। কিছু মানুষ এখানে হাপাসারা গ্রামে আছে, কিছু জারাগুড়িতে আছে। ওই গ্রামগুলি তখন ছিল কোকরাঝাড় জেলায়। এবারে যে দাঙ্গা হল, তার পরে আমাদের বঙ্গাইগাঁও জেলায় ১২টা শিবির হয়েছে; চিরাং জেলায় ২০টার বেশি আছে; কোকরাঝাড়, বিলাসিপাড়া, শ্রীরামপুর, চাপরে আছে। বর্তমানে এরকম ২৪৪টা শিবির আছে। আমরা সার্ভে করে দেখেছি।

শিবির : দনকিনামারি, বঙ্গাইগাঁও

আসিজুল খাতুন : পলানশোগুড়িতে (চিরাং জেলা) আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, ধাওয়া দিয়েছে। পিস্তল ধরছে, তীর মারছে, বাঁটুল দিয়ে মারছে। গাঁওবুড়া, চেয়ারম্যান সঙ্গে থেকেই মেরেছে। ভয়ে আমরা এসে পড়েছি। পাঁচঘণ্টা হেঁটে আমরা এসেছি এখানে। এই শিবিরে আমরা ১৫০০ মানুষ আছি। চিরাংয়ে আমাদের মেয়াদি পাট্টা দেয়নি আগের থেকে। মাটির পাট্টা বেশিরভাগ মানুষের নেই। তাদের নেবে না সরকার। আমরা বলছি, নিলে আমাদের সবাইকে নিতে হবে।

হাওয়া বানু : আমরা চিরাংয়ের ভবানীপুর গ্রাম থেকে এসেছি। আমাদের চারিদিকে বড়োরা ছিল, গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। বড়োরা একসাইড ধরে পুবদিকে যাচ্ছে। সেই দেখে গ্রামের মেয়েছেলেদের বার করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষরা সব গ্রামেই ছিল। তারপর পুবদিক থেকে আর্মির পোশাক পরে এসেছে। ব্রিজের মাথা থেকে ফায়ারিং চালিয়েছে। মানুষ সব সাইডে চলে গেছে। ওরা বস্তিতে ঢুকে পোড়াতে শুরু করেছে। যারা পালাতে পারেনি তারা উপুড় হয়ে লুকিয়ে ছিল। পোড়াপুড়ির পরে তারা আস্তে আস্তে বার হয়ে এসেছে। চারটে মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল, চারদিন পরে পাওয়া গেছে, জিন্দা আছে। একটা মেয়েছেলে মানুষকে দু-টুকরো করেছে। ২৪ তারিখ গোলাগুলি চলতে মানুষ খালি হাতে পালিয়ে এসেছে। কোকরাঝাড়ে আগে হওয়ার পরে জয়পুর, বেশরগাঁও, পানিয়াবাড়ি এসব জায়গায় হওয়ার পরে আমাদের দিকে হয়েছে। ওদিকে সব মানুষ সাইড হয়ে গিয়েছিল। আমরা সাহস করে ছিলাম, সাইড হইনি। থাকার পরে একজন খবর দিল, তোমরা ফ্যামিলি অল্প পার করে দাও, বিপদ হতে পারে। ওইটা হিসেব করে আমরা নাওঘাটে এসেছি। এসে দেখছি, সত্য সত্য সব মানুষ পার হচ্ছে। আমাদের ভয় ঢুকে গেল। আমরা মেয়েছেলেদের বললাম, তোমরা পার হয়ে যাও, আমরা পুরুষ মানুষেরা থাকব। জায়গায় জায়গায় আমরা বিশজন, পাঁচজন ডিউটি করছি। তিনটে গাড়ি এল। থানার আইসি এল। কী বলল, আমরা তো বলতে পারি না। তারা চলে গেল। এরপরই আর্মি-পোশাক পরে বাইকে করে ফায়ারিং শুরু করল। তখন আমরা কাগজপত্র আনব, না কাপড়চোপড় আনব, না টাকাপয়সা আনব, না ডেকচিপত্র আনব? নিজের জানটাকে নিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি। দৌড়ে দৌড়ে আই নদী আর নাগরভাঙা নদী পার হয়ে আমরা এলাম উদালগুড়ির গ্যাঁদাবাজার। নাওঘাটে যাওয়া সাহসে কুলায়নি, সাঁতরে নদী পার হয়ে এসেছি। সকালে আটটা নাগাদ বাচ্চা আর ফ্যামিলি নাও দিয়ে পার হয়েছে। এখানে এসে প্রথমে স্থানীয় মানুষ খাইয়েছে। তিনদিন পর সরকার ব্যবস্থা করেছে। এখন ক্যাম্পে থাকছি। থাকার চেয়ে মরাটা ভালো। ক্যাম্পের ভিতরে ছয় ইঞ্চি পানি উঠে গেছে। বাচ্চারা ঘুমাতে পারে না। কালকে ঘরটা দেখতে গেছিলাম। কিচ্ছু নাই। শুধু চালটা আছে। ঘরে তালা মেরে এসেছিলাম। সব খালি, একটা সুতাও নেই। এখন যে আমরা ফিরে যাব, কী খাব? সরকার তো চাল-ডাল দেয়। খড়ি তো দেয় না। জানের ভয় নিয়ে দশ-পনেরো জন মিলে যাই, কয়েকটা খড়ি নিয়ে পালিয়ে আসি। আমাদের কারো পাট্টা আছে, কারো নাই। আমার ছোটোভাইয়ের আট-দশ বিঘার পাট্টা আছে, আমার এক বিঘারও নাই। ঘটনা হল, আগের বুড়া মানুষ পাট্টা রেখেছে, তার ঘরে পাঁচটা ছেলে হয়েছে, ওরা বিয়ে করে বাড়ি করেছে, তাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে। সবার তো পাট্টা থাকবে না, ওই একটা নামে পাট্টা আছে। সরকার যার পাট্টা নাই, তাকে বাংলাদেশি বলছে। বাংলাদেশি যদি আমরা হই, তাহলে তাদের ভোট নিয়ে কংগ্রেস কী করে জিতল? মুসলমানের ভোট না পেলে কংগ্রেস মরে যায়! আমরা বাংলাদেশি, আমাদের নেতা বাংলাদেশি। ইন্দিরা গান্ধী মুসলমানের সঙ্গে কীসের জন্য বিয়ে করেছিল? ভারতের রাষ্ট্রপতি যে ছিল, সেও বাংলাদেশি? আমরা মুসলমান, আমরা সবাই বাংলাদেশি হলাম আজকে! মুসলমানের মরা ছাড়া গতি নাই।

আবুল কাসেম : পলানশোগুড়ি (চিরাং জেলা) থেকে এখানে এসেছি জুলাই মাসের ২৪ তারিখ, মঙ্গলবার। সোমবার দিন আমাদের বাড়ির থেকে পশ্চিমে জয়পুরে দেখলাম বেলা তিনটার সময় দুমদাম গোলাগুলি আরম্ভ করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পরদিন সকালে কয়েকটা গাড়ি এল। গোলাগুলি চলল। জানের ভয়ে সব এদিকে চলে এল। একজন বুড়ি মারা গেছে ওখানে গুলি লেগে, পালাতে পারেনি। ভবানীপুর থেকে আরম্ভ করেছে, ওখানে মাকরা নদী আছে। গ্রামের নাম কানা মাকরা। পুবের থেকে বাইক নিয়ে এসেছে। আমরা দক্ষিণ দিকে পায়ে হেঁটে এলাম। আই নদীর খেয়া আছে, সব মানুষ পার হয়ে এখানে এসে জমা হল। মেয়েছেলেরা দুদিনে এসে এখানে জমা হয়েছে।

মনোয়ারা বিবি : ভবানীপুর গ্রামে আগে থেকে কোনো বিবাদ আমরা বুঝলাম না। আগে বড়োদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। সোমবার সকালে আমরা সব মেয়েমানুষ পার হয়ে এসে পড়লাম। আমাদের পুরুষ মানুষেরা ডিউটি করার জন্য ওখানে রইল। তারপর সকাল দশটার সময় ওরা ব্রিজে এসে গোলাগুলি আরম্ভ করেছে। রাতে আমরা গ্যাঁদাবাজারে রইলাম। বেলা ওঠার আগে আমরা এখানকার পথ ধরেছি। ওই ব্রিজের ওখানে এসে বসেছিলাম। তারপর এখানকার মানুষ গিয়ে আমাদের নিয়ে এল। কিছু গেছে হাপাসরা, গরাইমারিতে, আমরা এখানে এলাম। আমরা তিনদিন না-খাওয়া ছিলাম। সরকার সবাইকে ফেরত নেবে না। যাদের মেয়াদি পাট্টা আছে, তাদের আগে নেবে। এখন তিনদিন বাদে বাদে চাল ডাল তেল মরিচ দেয়।

শিবির : গরাইমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বঙ্গাইগাঁও

মহঃ আফজালুর রহমান : আমার গ্রাম ১নং দংশিয়াপাড়া। এটা চিরাংয়ের মধ্যে পড়েছে। আমাদের আশপাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। আমাদের ঘরবাড়ি সব লুঠপাট হয়ে গেছে। গ্রামের উত্তর আর পশ্চিম সাইডে পুড়িয়ে দিয়েছে। ২৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়েছিল। আমরা বেরিয়ে এলাম। কেউ আগে এসেছে, আমরা পরে এসেছি, আমাদের পরেও এসেছে আরও মানুষ। যখন গুলি চালাল। তখন মানুষ তো আর থাকতে পারে না। দংশিয়াপাড়া আর দক্ষিণ মাকরা পোড়ায়নি। ওখানে খবর পেয়ে বিভিন্ন সংগঠন থেকে গাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে স্থানীয় ক্লাব আর মানুষ আমাদের সংস্থাপন দিয়েছে। দুইদিন পর থেকে সরকারি দান আমরা পেয়েছি। এখানে ৭৬টা পরিবার আছে। মাদ্রাসা শিবিরে আছে ৮৯টা পরিবার। আমাদের দংশিয়াপাড়ার গাঁওবুড়াও চলে এসেছে। কোকরাঝাড়ে যখন পুড়িয়ে দেয়, আমরা বিভিন্ন সরকারি মহলে নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। এসডিও আর ডিসি-কে আমরা ফোন করলাম। আমরা সামরিক বাহিনী চাইলাম। কিন্তু তারা কোনো সাহায্য করেনি। আমাদের গ্রামের ভিসিডিসি-র চেয়ারম্যান দারগা বসুমাতারি। তিনিও ঘর জ্বালানোর সময় ছিলেন। আগে আমাদের মেলামেশা ছিল। একসঙ্গে খেলতাম, বেড়াতাম, বাজার করতাম। উগ্রপন্থী সংগঠন বিএলটি বা এনডিএফবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা এটা করেছে। উগ্রপন্থীদের হাতে অবৈধ অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্র নিয়ে ওরা হামলা করল। ঘর জ্বালানোর সময় ওরা বিপিএফ-এর পতাকা নিয়ে এসেছিল। মাটির পাট্টা কারো হারিয়ে গেছে, কারো পুড়ে গেছে, কারো নেই। সেইজন্য আমাদের ফেরার ব্যাপারে কিছু হচ্ছে না। আমরা ভারতীয় নাগরিক, আমাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে। বড়োল্যান্ডের আইন আছে, আমাদের মেয়াদি পাট্টায় নামধারী হয় না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে জমি করেছিল, তার পাট্টা আছে।

শিবির : লক্ষ্মীপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, বঙ্গাইগাঁও

মহঃ নাজমুল হক : আমি ১নং দংশিয়াপাড়া থেকে এসেছি। এখানে আটটার বেশি গ্রামের লোক এসেছে — ফরমায়েসালি, দংশিয়াপাড়া, উত্তর বল্লমগুড়ি, আমগুড়ি, ভাওরাগুড়ি, মকনাগুড়ি, লাউকুরগুড়ি, মাজরাবাড়ি, আমড়াগুড়ি, ২-৩-৪নং দক্ষিণ মাকরা — চিরাংয়ের উত্তরে ফরেস্টের লাগোয়া সব গ্রাম। হঠাৎ করে আগুন লাগিয়ে ঘর পোড়ানো আরম্ভ করল। ২৩ জুলাই সন্ধ্যা সাতটার সময় ওরা এল। আমরা দৌড়াদৌড়ি করে সব একসাইডে হয়ে গেলাম। তারপরে ফোন করে গাড়ি পাঠানো হল। পরেরদিন আমরা ক্যাম্পে এসে পড়লাম। সব চেনা লোকই পুড়িয়েছে, বন্দুক চালিয়েছে। এখন ওখানে পুলিশের ক্যাম্প আছে। এখানে ৪১৩টা পরিবার আছে, লোক আছে মোট ১৮০৯। মণ্ডল এসে র‍্যাশন দেয়। পনেরো-বিশদিন আগে এসে পানিরাম বড়ো বলল, তোমরা এখানে থাকো, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাব। তারপর আসেও না, কিছু করেও না। আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু টিভিতে বড়ো মিনিস্টার বলেছে, যাদের মেয়াদি পাট্টা আছে তাদের নেবে, খাস মাটির লোককে নেবে না। বড়োরাও খাস মাটিতে আছে। ওরা যদি খাস মাটিতে থাকতে পারে, আমরা কেন থাকতে পারব না? আমাদের গ্রামে আগে পাট্টা জমি ছিল, তারপর নদী হয়ে গেল জায়গাটা। সেটা খাস হয়ে গেছে, সেখানে বসতবাড়ি আছে। কেউ ত্রিশ বছর, কেউ চল্লিশ বছর আছে। তাদের ভোট আছে। আমি চারবার বাড়ি পাল্টিয়েছি। নদী ভাঙন হয়, লোকে সরে যায়। এইবছর ভাঙে নাই। যাদের বাড়ি পোড়েনি, তাদেরও সব লুঠ হয়ে গেছে। তারা যে ফিরে যাবে, খাবে কী? সরকারকে কম-সে-কম ছ-মাস চালাতে হবে তাদের, তারপর কোনো একটা ব্যবস্থা হবে। একটা মানুষের খরচা কত আছে? আজকে দুই কেজি চাল হলে, তরকারির খরচ পঞ্চাশ-ষাট টাকা। আজ এক পোয়া মাছ কিনতে লাগে ষাট টাকা।

জয়নাল আবেদিন : আমাদের এখানে ভবানীপুর, পশ্চিম গুমারগাঁও, চিকাপাড়া, পলানশোগুড়ি এই চারটে গ্রামের মানুষ এসেছি। ২২ তারিখ থেকে আমাদের ওখানে উত্তেজনা চলল। ২৪ তারিখে বিকেল আড়াইটার সময় আমাদের বস্তি আক্রমণ করল। ওদের দলে ছিল প্রথমে চারজন, সেনাবাহিনীর পোশাকধারী। ওদের হাতে ছিল মারণাস্ত্র একে-৪৭, তার পিছনে ছিল কমান্ডো বাহিনী ১৫-১৬ জন। তার পিছনে ছিল ওদের পাবলিক, তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক। আমাদের হাতে তো কোনো অস্ত্র নাই। সেই কারণে আমরা বস্তি ছাড়তে বাধ্য হলাম। প্রথমে আমাদের মেয়েদের আমরা আই নদীর কিনারে রেখেছিলাম, উদালগুড়িতে। আমরা পুরুষেরা বস্তিতে ডিউটি

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন, ধুবড়ি (বেদলাংমারি), ২৪ আগস্ট : কোকরাঝাড়ের উপকণ্ঠে ছোট্ট জনপদ বেদলাংমারি গ্রাম। গ্রামবাসীদের সবাই বাংলাভাষী মুসলমান। ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর, পুকুর, মেঠোপথ, গ্রামীণ জীবনের সব উপকরণ মজুত থাকলেও গোটা গ্রাম এখন জনশূন্য। মেঠোপথ আলপথ ধরে মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ কুকুর, বেড়াল ছুটে বেড়ালেও গত এক মাসে বেদলাংমারিতে জন মানুষের পা পড়েনি। গ্রামবাসীদের বর্তমান ঠিকানা অস্থায়ী আশ্রয়শিবির। জুলাইয়ের মাঝামাঝি রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার শুরুতে আট বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ সবাই প্রাণের ভয়ে ধুবড়ির শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা কলিমুদ্দিন শেখ, খলিলুদ্দিনরা নিরাপদ আশ্রয় শিবিরেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন না। তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে হাগ্রামা মহিলারির ফতোয়া। বিটিসির শাসকদের চোখে খলিলুদ্দিনদের পড়শিদের সবাই সন্দেহভাজন বাংলাদেশি। নাগরিকত্বের প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রামে ফিরতে দেওয়া হবে না। দাঙ্গায় গৃহহীনদের সিংহভাগ হাগ্রামাদের বিবেচনায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। কারণ বিপিএফ নেতৃত্ব বিশ্বাস করে, সন্দেহভাজন বাংলাদেশিদের সঙ্গে ভূমিপুত্র বড়ো সম্প্রদায়ের লড়াই চলছে। তাই গ্রামছাড়া গৃহহীনদের নাগরিকত্ব বিপিএফ নেতৃত্বের স্ক্যানিংয়ের আওতায় চলে এসেছে। কলিমুদ্দিন শেখ, খলিলুদ্দিনরা বুঝতে পারছেন না, তাঁদের কেন বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করছেন হাগ্রামা। ৬২ বছরের বৃদ্ধ কলিমুদ্দিনের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়া প্রমাণপত্র রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনেও পূর্ব বিলাসীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন কলিমুদ্দিন শেখ। ধুবড়ি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের প্রমাণপত্রও তাঁর সঙ্গে রয়েছে। ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকায় নথিবদ্ধ রয়েছে তাঁর বাবা রমজান আলির নাম। কলিমুদ্দিনের পড়শি মোহাম্মদ খলিলুদ্দিনের কাছেও রয়েছে নাগরিকত্বের সরকারি প্রমাণপত্র। ৩৭ বছরের দিনমজুর খলিলুদ্দিন ঘর ছেড়ে পালানোর সময় ল্যামিনেশন করা প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

কলিমুদ্দিন, খলিলুদ্দিনদের আক্ষেপ — রাজ্য সরকারের পদাধিকারীদের স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র থাকলেও বিটিসির শাসকরা তাদের ছাড়পত্র দিতে রাজি নন। মহিলারিদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে গ্রামে ফেরার মতো বুকের পাটা কারও নেই। শিবিরের সিংহভাগ বাসিন্দা বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করছে বড়ো নেতৃত্ব। কারণ বিটিসির উপমুখ্য কার্যবাহী সদস্য খাম্পা বরগয়ারির বিশ্লেষণ হল, কোকরাঝাড়ের মোট জনসংখ্যার ২ লক্ষ ৩৬ হাজার হল মুসলিম। এদের মাত্র ৫০ শতাংশ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। বিটিসির সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ ঘর ছাড়লে শিবিরে শিবিরে আশ্রিত মুসলমানদের সংখ্যা চার লক্ষ কেমন করে হল? বড়ো নেতৃত্ব নিশ্চিত, অনুপ্রবেশকারীরা শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রশ্ন হল, কলিমুদ্দিন, খলিলুদ্দিনরা যদি বাংলাদেশি তবে তাদের হাতে বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র কীভাবে এল? তাহলে এই প্রমাণপত্র কি ভুয়ো? ভুয়ো প্রমাণপত্র বাংলাদেশিরা কীভাবে সংগ্রহ করল? বিটিসি নেতৃত্বের কাছে এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই।

করছিলাম। আড়াইটার সময় ওরা হামলা করল। আমাদের গরু–বাছুর বহু মারা গেছে। আমরা সাইড হয়ে গেলাম। একজন বৃদ্ধা মারা গেছে। আমাদের মানুষ বেহুঁশ হয়ে জঙ্গলে পড়েছিল। পরে ওদের উঠিয়ে নিয়েছি। এক রাত আমরা জঙ্গলে ছিলাম। এক রাত এক দিন বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে না খেয়েদেয়ে এখানে এলাম। এখানকার লোকে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, গ্রামের থেকে চাল–ডাল সংগ্রহ করে খিচুড়ি বানিয়ে আমাদের দুদিন খাইয়েছে। তারপরে সরকারি রেশন আমরা পাচ্ছি। গণ্ডগোলের প্রথমে আমরা গাঁওবুড়া নবীন বসুমাতারি আর পানেশ্বর রাভাকে বলেছি, ভিসিডিসি–র চেয়ারম্যান পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মকে বলেছি। এরা বলল, আমাদের তো করার কিছু নেই, তোরা সাবধানে থাক। আমরা আইসি–র কাছে গেলাম। বললাম, একটা কোম্পানি ফৌজি আমাদের ওখানে দিন। তিনি বললেন, এসপি–কে ফোন করেছি। দুদিন চলে গেল, ফৌজি এল না। শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিল। যেসময় আগুন লাগাল, তার দশ মিনিট আগে আইসি–র গাড়ি ওখানে ছিল। সেইসময় ব্রিজের পুবদিক থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর দুটো গাড়ি এল। ওই গাড়ি থেকেই অস্ত্রধারী মানুষ নেমেছে। আজ ১৫ তারিখ, ১২ তারিখ আমরা তিনটা শিবিরের লোক ডিসি অফিসে গেছিলাম। আমরা বললাম, স্যার আমাদের শুনলাম আই নদীর ধারে ক্যাম্প দেবেন। ওখানে না নিয়ে আমাদের গ্রামে নিয়ে চলুন। এখনও আমাদের শস্য মাঠে পড়ে আছে। গ্রামে গেলে শস্যগুলো উদ্ধার হবে, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুলে যেতে পারবে। ভবানীপুরে শতকরা ৩০% মেয়াদি পাট্টাধারী আছে, ৭০% খাসল্যান্ড; আমাদের পশ্চিম গুমারগাঁওয়ে ৯৫% পাট্টাল্যান্ড, ৫% খাস; পলানশোগুড়ির একটাও খাস নেই, পুরোটাই পাট্টাধারী; চিকাপাড়া পুরোটাই পাট্টাধারী। যাদের কাগজ পুড়ে গেছে, অফিসে তো রেকর্ড আছে। ওদের ইচ্ছা, খাসমাটির লোককে ওরা পুনর্বাসন দেবে না। কিন্তু কাগজপত্র আমাদের সব আছে। আমাদের ১৯৬৫–৬৬–৭০–এর সব ভোটার আছে, কিছু নতুন ভোটার আছে। যারা খাসজমিতে বাস করে, তাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে, রেশন কার্ড আছে, ভিসিডিসির সার্টিফিকেট আছে, বিপিএল কার্ড আছে। যে ভূমিহীন, যার মাটি নাই, সে আর কাগজ কোথা থেকে দেবে?

শিবির : কাউয়াটিকা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, চিরাং

আসগর আলি : আমি ২নং ভলাতল গ্রাম থেকে এসেছি। ২২ জুলাই আমার ছেলে ও মামাতো ভাইকে ওরা গুলি করে মারে। ছেলের নাম হাসেম আলি আর মামাতো ভাইয়ের নাম নুর হোসেন আলি। আমার ছেলেকে ৬টা গুলি করেছে আর নুর হোসেনকে ৭টা গুলি করেছে। ২৩ তারিখ বডি পোস্ট মর্টেম করে আনে সন্ধ্যা ৭টার সময়। আটটার দিকে দাফন করা হয়েছে। ওইদিন রাতে আমরা মাজরাবাড়িতে থেকেছি। মঙ্গলবার ২৪ তারিখ আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন আমরা হতবুদ্ধি হয়ে শিবিরে এসেছি। দু–ঘণ্টা পায়ে হেঁটে আসার পর এখানকার মানুষ সহায় হয়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে।

আমাদের গ্রামের পুব সাইডে বড়ো, উত্তর সাইডে বড়ো আর দক্ষিণ সাইডে আমাদের মুসলমান বস্তি। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই ছিল। ২২ তারিখে মারার পর আমাদের লোক পালিয়ে এসেছে। আমাদের গাঁওবুড়া বড়ো, নিজে এসে আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওসি, অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও, এক্স–এমএলএ, আরও অনেকে সেইসময় ওখানে এসেছিল দেখতে। সেইসময়ই ঘটনা ঘটেছে।

আমার ছেলে আর মামাতো ভাই মঙ্গোলিয়ান বাজারে গিয়েছিল। এমন সময় একটা চ্যাংড়া এসে খবর দিল, অমুক অমুককে মেরে ফেলেছে, আরও অনেককে মারবে। হুলুস্থুলু কান্নাকাটি লেগে গেল, আমাদের লোককে মেরে ফেলেছে। ওখানে ব্যাটেলিয়ন ছিল, বললাম, আমাদের লোককে মেরে ফেলেছে, তোমরা সহায় করো। কেউ যায়নি। ওসি সাহেবকে ফোন করায় তিনি গেছেন, তারপর তিনিই গাড়ি নিয়ে লাশগুলো নিয়ে এসেছেন। সাংবাদিক গেছে, ফটো তুলেছে।

এখানে আসার পর আমরা বিজনি থানায় কেস করেছি। এখন সিকিউরিটির ব্যবস্থা হলে আমরা ফিরে যাব। কিন্তু সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

এরপর অন্যরা বলতে শুরু করে : আমাদের মেয়াদি পাট্টা আছে। খাস জমি আছে, কম। আমাদের সাব–রেজিস্ট্রার হল বিজনির, সেখানে রেজিস্ট্রি দেয় না। বড়োদের জমি অ–বড়োদের রেজিস্ট্রি হয় না। যারা না জেনে কিনেছে, তাদের নামধারী হয় না। আমাদের জমি যদি বড়োরা কেনে, তাহলে রেজিস্ট্রি হতে পারে, নামধারী হতে পারে। এটা বিটিসি হওয়ার পরে হয়েছে। বাপের জমি বেটার কাছে গেলেও নামধারী হয় না, সেটাও বন্ধ।

আমরা পাট, ধান সবই লাগিয়েছিলাম, পেকেছিল। ওখানে যে সিকিউরিটি আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দু–চারজনে কেটে এনেছে। সামনের দিকে যেগুলো আছে, আমরা কথা বলেছি, ১৫–২০ জন গিয়ে কেটে আনবে। সেই ফসল ওরা নষ্ট করেনি। যেগুলো ওদের নিকটবর্তী ছিল সেগুলো ছাড়া বাকি সব ঠিক আছে। আমরা গেছি মাঝে। বড়োদের সঙ্গে দেখাও হচ্ছে। ওরা কথা বলে না, আমরাও বলি না। আমাদের ভলাতল গ্রামের প্রায় মানুষই যায়। এখানে খড়ির ব্যবস্থা নেই, খড়ি আনতে যায়। সব্জি আনতেও যায়। পাঁচ–ছয়জন একসঙ্গে যাওয়া–আসা করে।

এখানে ভলাতল গ্রামের ১৩০টা পরিবার আছে, মোট ৬৩০ জন। সরকার আমাদের চাল, ডাল, নুন, তেল দেয়, বাচ্চাদের জন্য বেবিফুড দেয়।

আসলে আমাদের ওখানে স্কুলের যে টাকা এসেছিল, ওই টাকার দশ পার্সেন্ট ওদের পার্টির চ্যাংড়ারা নিয়ে যায়। আগে একবার কিছু দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও একটা কিস্তি নিতে আসে দু–তিনজন। স্কুল কমিটি বলেছে, টাকা নাই। জোরজুলুম ওরা চায়। গ্রামের লোক কিছু আছে, যারা বলে, এবার টাকা আমরা দেব না। ১৯ তারিখ দুজন উগ্রপন্থী আসে, ওদের ধরে থানায় দেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই লাগল ফ্রিক্শন। ওরা এনডিএফবি। আমাদের ওখান থেকে দুই–আড়াই কিলোমিটার দূরে মঙ্গোলিয়ান বাজার আছে। রবিবার ২২ তারিখ আমাদের গ্রাম থেকে কিছু লোক বাজার করতে গেছে। ভলাতল, মাজরাবাড়ি থেকে গিয়ে কেউ সব্জি কিনে আনে, কেউ শুকনো মাছ বিক্রি করতে যায়। হাসেম আলিকে ধরেছে দুটো চ্যাংড়া। হাসেম নুর হোসেনকে ডাক দিয়েছে, আমাকে মেরে ফেলে। ওরা গুলি করেছে। নুর হোসেন এগিয়ে গেছে, ওকেও মেরেছে। মারার পর হই হল্লা। বাজারে যারা ছিল, তারা ভেগে এসে পড়ল। আর দুটো লোক ওদের নজদিকে ছিল, ওরা ভাগবার কুল পায়নি। অন্যদিকে গেছিল, গ্রামে এল রাত বারোটার সময়। আমরা ভাবছি, ওরা নাই, চারটেই মারা গেছে। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ চতুর্দিক থেকে বড়োরা এসে আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিল।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।

ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666